কালিম্পঙের কালো রাত

ড. অন্তরা চৌধুরি

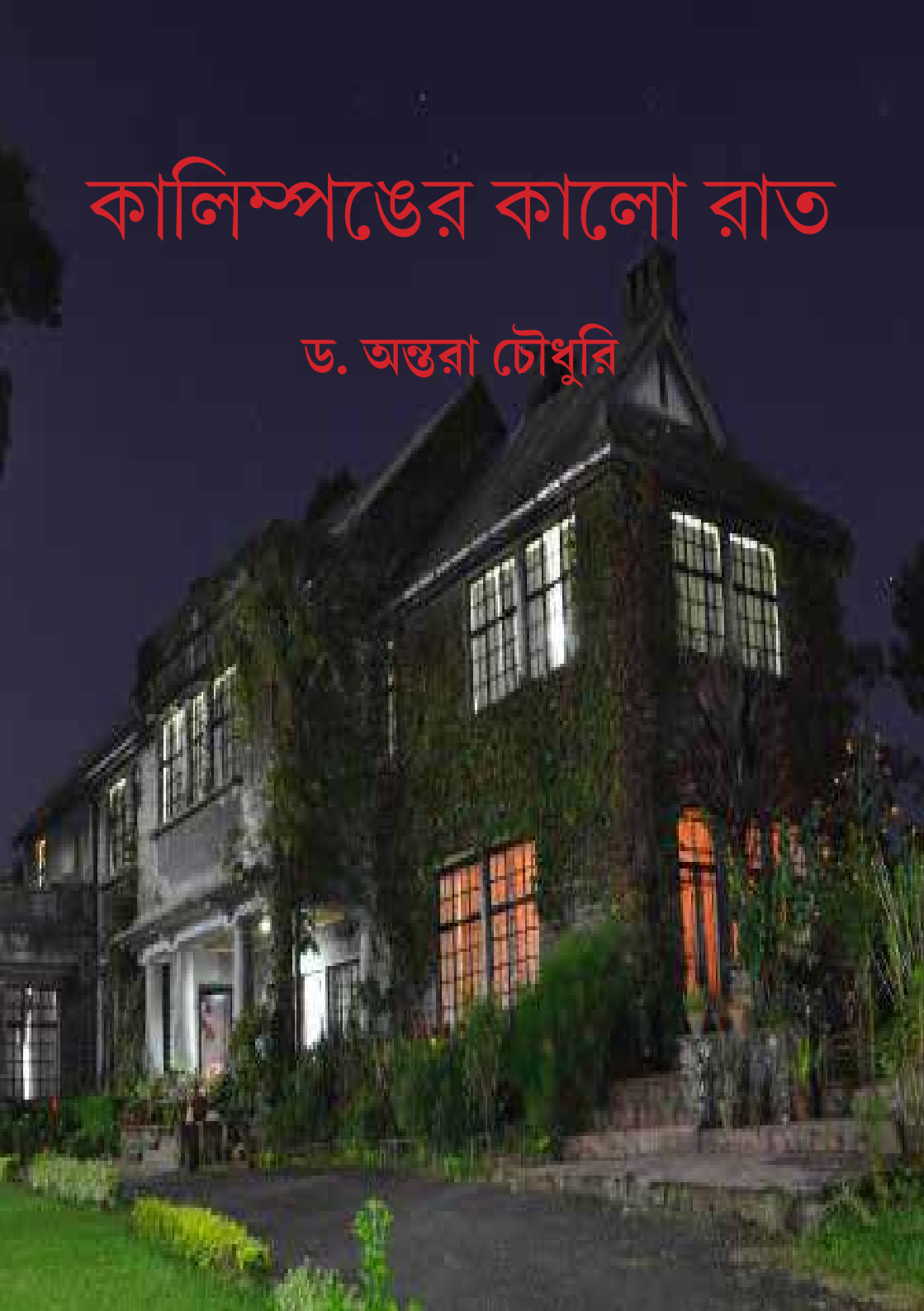

কালিম্পঙের কালো রাত

ড. অন্তরা চৌধুরি

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ২০২৩

যোগাযোগ
বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন
কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬

ফোন
৯৬১৪৪৫০৪৫৫
ই-মেল
antara.chaudhuri@gmail.com

উৎসর্গ

পাণ্ডব গোয়েন্দার স্রষ্টা, সদ্যপ্রয়াত সাহিত্যিক
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়কে।

লেখিকার অন্যান্য বই

- ❑ কথাসাহিত্যের নানা মুখ
- ❑ টুকরো টুকরো কত ছবি
- ❑ পাহাড়ের দিনরাত্রি
- ❑ জিভে জল

সবিনয় নিবেদন

বছর তিন আগের কথা। তখন পুরোদস্তুর লকডাউন। পৃথিবী যেন থমকে আছে। তখনই হঠাৎ করে প্রস্তাব এল, একটা ভৌতিক উপন্যাস লিখতে হবে। হাতে সময় বিশেষ নেই। একমাসের মধ্যেই জমা দিতে হবে।

পড়লাম অথৈ জলে। ছোট থেকেই ভূতের গল্প, উপন্যাস পড়েছি অনেক। কিন্তু কখনও লেখা তো হয়নি। বা, কখনও লিখতে হবে, এমনটা ভাবিওনি। একেবারে সরাসরি উপন্যাস! কিছুটা ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। কোন প্রেক্ষাপটে লেখা যায়, সেটা ভাবতেই কয়েকদিন কেটে গেল।

হঠাৎ, মাথায় এসে গেল কালিম্পঙের মর্গান হাউসের কথা। তার ঠিক কয়েকমাস আগেই সেই মর্গান হাউস থেকে ঘুরে এসেছি। গুগলে ‘হন্টেজ প্লেস’ সার্চ করলে একেবারে সামনের সারিতেই এসে যায় এই মর্গান হাউসের নাম। বেশ গা ছমছমে একটা অনুভূতিও হয়েছিল। মনে হল, সেই মর্গান হাউসকে সামনে রেখে যদি লেখা যায়!

অনেকেই বলল, শুরু তো করো। তারপর পথই পথ বলে দেবে। ‘জয়বাবা ভূতনাথ’ বলে শুরু করে দিলাম। অদ্ভুত একটা আবহ তৈরি হল। আর বোধ হয় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। মর্গান হাউস ছেড়ে

কোথায় পৌঁছে গেলাম! পাহাড়ের অচেনা পথের বাঁকের মতোই গল্পও আপন নিয়মে বাঁক নিল। কী জানি, সেই 'ভূত'ই হয়ত আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল।

না পৃথিবী। সুপার ন্যাচারাল বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন, এমন লেখকদের একটি সংগঠন। প্রতিবছর বইমেলায় খুব যত্ন নিয়ে তাঁরা বইপ্রকাশ করেন। পাঁচটি ভিন্নধারার উপন্যাসের সংকলন। তাঁদের জন্যই এই উপন্যাস লেখা। কিন্তু পরের বছর কোভিডের জন্য বইমেলাই হল না। ফলে, বইটি দিনের আলো দেখল ২০২২ নাগাদ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপমন্যু রায়কে। তাঁর জোরাজুরিতেই এই লেখা।

এই লেখায় ভূত যেমন আছে, তেমনই ভ্রমণও আছে পুরোমাত্রায়। আছে উত্তরবঙ্গের অনেক অচেনা জায়গার হদিশ। আছে সম্পর্কের জটিল রসায়ন। কখনও ভয়, কখনও রোমাঞ্চ, কখনও স্মৃতির সরণি বেয়ে হেঁটে যাওয়া। সবমিলিয়েই 'কালিম্পঙের কালো রাত'। যাঁকে এই উপন্যাস উৎসর্গ করেছিলাম, তাঁর হাতেই সেই সংকলনটা তুলে দিতে পারলাম না। এই আক্ষেপটাও থেকেই যাবে।

ড. অন্তরা চৌধুরি

ঘুমের ঘোরে অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছে বিতান। এক মুহূর্তও স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে পারছে না। ঘুম ভেঙে যায় কুর্চির। খাটের পাশে থাকা টেবিল ল্যাম্প জ্বালতেই সে দেখে, বিতান ঘুমের ঘোরে সমানে মাথা নাড়ছে আর কী যেন বলছে। কুর্চি গ্লাস থেকে একটু জল নিয়ে বিতানের চোখে মুখে ছিটিয়ে দেয়, ''বিতান, এই বিতান, কী হল? ঘুমের ঘোরে কী বকছ বলো তো?''

বিতান ধড়মড় করে উঠে বসে। তার চোখ দুটো বেশ লাল। বলে, ''না মানে ওই স্বপ্নটা—। কোথায় যেন! খুব আবছা। একটা মুখ। অস্পষ্ট।''

— ''ওহ্! তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আবার সেই স্বপ্নের গল্প শুরু করলে তো? কোথায় পাহাড়, কার বাড়ি, কার মুখ কে জানে! বিয়ের পর দু'বছর কেটে গেল! তবু তোমার এই স্বপ্ন দেখার রোগটা আর গেল না। রোজ রোজ আজেবাজে স্বপ্ন দেখে ভয় পাবে, আর আমার ঘুমের বারোটা বাজাবে। ভালো লাগে না বিতান। সারাদিন কলেজে পড়িয়ে রাতে যে একটু শান্তিতে ঘুমোব, তার উপায় নেই।''

নিজের মাথার চুল চেপে ধরে হতাশার সুরে বিতান বলে, ''জানি না কুর্চি। এই একটা স্বপ্ন আমাকে পাগল করে দেয়। বারবার একই স্বপ্ন কেন যে দেখি! আচ্ছা কুর্চি, স্বপ্ন দেখায় মানুষের কোনও নিয়ন্ত্রন কি থাকে?'' বলেই কুর্চির কোলে মাথা রাখে।

বড় অসহায় লাগে বিতানকে। কুর্চি বিতানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, ''সারাদিন অফিসেও তো তোমার পরিশ্রম কম হয় না। আমাদের দু'জনেরই একটু লম্বা রেস্ট দরকার। যাও, চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে এসে ঘুমোও।'' বলেই গায়ে চাদরটা টেনে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে কুর্চি।

ঘড়িতে এখন রাত দেড়টা। প্রায়ই ঠিক এই সময়ে বিতানের ঘুম ভেঙে যায়।

এলোমেলো ভাবনাগুলো ভাবতে ভাবতে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে লাইট অফ করে শুয়ে পড়ে বিতান। কিন্তু মন থেকে স্বপ্নের রেশ কাটে না। সেই ধূসর রঙের বাড়ি পাহাড়ের ধারে, আর একটা মেয়ের সেই অস্পষ্ট মুখের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

২

বিতান চাকরি করে আইটি সেক্টরে। সল্টলেকে তার অফিস। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। কুর্চি স্কটিশে ইতিহাস পড়ায়। বয়স বত্রিশ। ওদের পরিচয়টা হয়েছিল ট্রেনে। বিতান তখন যাদবপুর থেকে এম টেক কমপ্লিট করে একটা ছোটখাটো কোম্পানিতে চাকরি করে। আর কুর্চি প্রেসিডেন্সিতে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছে। বিতানের বাড়ি আসানসোলে আর কুর্চির দুর্গাপুরে। সময়টা ছিল শীতকাল। বিতান সেদিন ভোর বেলায় হাওড়া সুপারফাস্ট ট্রেনটা ধরেছিল। থিকথিক করছে ভিড়। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। তবু কীভাবে যেন একটা সিট ম্যানেজ করে বসে পড়েছিল।

কুর্চি উঠেছিল দুর্গাপুর থেকে। সেদিন ট্রেনটা আসানসোলেই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই দুর্গাপুরে যখন সেই ট্রেন এলো, তখন অবস্থা আরও শোচনীয়। কুর্চি কোনও রকমে ট্রেনে উঠে বসার আশা ছেড়ে দিয়ে একটা জায়গা ম্যানেজ করে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ এক ভদ্রলোক বিতানের পাশ থেকে উঠে, কুর্চিকে তার সিটে বসতে দিয়ে সামনের স্টেশনে নেমে যায়। সারা রাস্তা কুর্চি ও বিতান একসঙ্গে এলেও কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু হাওড়ায় ঢোকার কিছুক্ষণ আগে সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেনটা থেমে যায়। সেই মুহূর্তে কুর্চির চাদরের কিছুটা অংশ আটকে যায় বিতানের ব্যাগের চেনে। সেটা ছাড়াতে গিয়েই দু'জনের প্রাথমিক কথাবার্তা হয়। কুকিজ বিনিময় হয়। তার পর ট্রেন থেকে নামার সময় বিতানই কুর্চির ফোন নাম্বার চেয়ে নিয়েছিল। বিতানকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গিয়েছিল কুর্চির।

কথা বলে আরও বেশি ভালো লেগেছিল। কিন্তু হাবেভাবে সে কথা প্রকাশ করেনি। এত সোবার ছেলে সে আগে দেখেনি। হস্টেলে ফেরার পর প্রথম

ফোনটা বিতানই করেছিল। তার পর যা হয়। রাতভোর ফোন। টুকটাক দেখা হওয়া। কাছে আসা। মুগ্ধতা। ভালো লাগা। ভালবাসা। যদিও ভালবাসার কথা কুর্চি আগে বলেনি। কারণ আমাদের সমাজে আজও মেয়েরা আগে ভালবাসা নিবেদন করলে কোথাও নাকি তার ডিগনিটি লুজ হয়। তার পর যে যার মতো জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ওদের বিয়ে হয়।

৩

স্বপ্ন দেখা রাতের পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে দু'জনে দুটো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। অফিসে ঢোকার মুখেই বিতানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তৃণাঞ্জনের। তৃণাঞ্জন বিতানের খুব কাছের বন্ধু। বলা ভালো প্রিয় বন্ধু।
দু'জনে একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। দেখা হওয়া মাত্রই গাড়ি থেকে নেমে জড়িয়ে ধরে তৃণাঞ্জনকে।
— ''কী রে, তুই এখানে? কতদিন পর দেখা তোর সঙ্গে! তোকে যে কতবার ফোন করেছি! একটা নাম্বারেও যদি ফোন যায়! ফেসবুকেও কত খুঁজেছি!'
হাসতে হাসতে তৃণাঞ্জন বলে, ''এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করলে কোনটা উত্তর দেব বল তো? আমার হ্যান্ডসেটটা শপিং মলে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই এই বিপত্তি। শোন, হাতে এখন একদম সময় নেই। বসের সঙ্গে মিটিং আছে। তিনি আবার খুব পাংচুয়াল। আমি উইপ্রোতে জয়েন করেছি। বিকেলে ফাঁকা আছিস? চল, দু'জনে মিলে কোথাও আজ আড্ডা মারি।'' বলেই পরস্পরের মোবাইল নাম্বার নিয়ে যে যার অফিসে চলে যায়।
বিকেলে তৃণাঞ্জনই চলে আসে বিতানের অফিসে। ''তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে'' বলেই টানতে টানতে বিতানকে নিয়ে গাড়িতে করে চলে আসে বিশ্ব বাংলা রেস্টুরেন্টে। লিফটে উঠতে উঠতে তৃণাঞ্জন বলে, ''আজ কী সাম, মেরে দোস্ত কী নাম! আজ মিটিং শেষ হওয়ার পরই এখানে টেবিল বুকিং করে নিয়েছিলাম।''
খাবারের অর্ডার দিয়ে দু'জনে একটা করে ড্রিঙ্কস আর স্টার্টার নিয়ে আয়েস করে বসে। টুকটাক কথার পর বিতানকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখে তৃণাঞ্জন জিজ্ঞাসা

করে, ''কী হয়েছে বিতান? কেমন যেন ছটফট করছিস? এনি প্রবলেম?''
বিতান কিছুটা চাপা স্বরে অন্যমনস্ক হয়ে বলে, ''জানি না। ঠিক বুঝতে পারছি না।''
— ''কী হয়েছে বল। এনি প্রবলেম উইথ কুর্চি?''
বিতান তৃণাঞ্জনের হাতটা ধরে বলে, ''আমাদের সম্পর্কটা ঠিক মুভ অন হচ্ছে না। যে কোনও দিন আমাদের সম্পর্কটা ভেঙে যেতে পারে।''
— ''কী বলছিস পাগলের মতো? এতদিন প্রেম করার পর বিয়ে করলি! দু'বছর যেতে না যেতেই এই কথা!''
— ''বিয়ের পর থেকে একটা স্বপ্ন আমাকে শেষ করে দিচ্ছে।''
— ''স্বপ্ন? কী স্বপ্ন?''
— ''তুই কি আমার কথা বিশ্বাস করবি?''
— ''হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করব। কেন করব না?''
— ''দেখ, আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র। সব কথা আমার মুখে শুনলে তুই নেহাত আমায় পাগল বলবি।''
— ''আরে তুই বল তো।''
— ''তা হলে প্রথম থেকেই বলি। দ্যাখ, কুর্চির সঙ্গে আমার প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু বিয়ের পর থেকে নানা কারণে একটার পর একটা অশান্তি চলতেই থাকে। আসলে আমি বুঝিনি যে, ফোনে প্রেম করা এক জিনিস, আর এক ছাদের তলায় একসঙ্গে থাকা এক জিনিস। তা ছাড়া বিয়ের পর থেকে রোজ না হলেও মাঝে মাঝেই আমি একটা বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নটা কিন্তু স্পষ্ট নয়। অন্ধকার রাতে বিদ্যুতের আলোর ঝলকানির মতোই একটা বাড়ি। পাহাড়ের ধারে। অনেক পুরনো দিনের। পরিত্যক্ত। রঙটা ধূসর। আর দেখি একটা মেয়ে। সুন্দরী। বারবার মুখটা দেখি। যদিও খুব আবছা, অস্পষ্ট। যেন আমাকে কিছু বলতে চায় ওই বাড়ি, আর ওই মেয়েটা! এই স্বপ্নটা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। কুর্চিকে অনেকবার বলেছি। ও শুনতেই চায় না। রাগ করে।''
টেবিলে ততক্ষণে ফ্রায়েড চিলি চিকেন আর সেজোয়ান ফ্রায়েড রাইস চলে এসেছে। তৃণাঞ্জন, কুর্চি আর মেঘনার জন্যেও খাবার প্যাক করে দিতে বলে।

মেঘনা তৃণাঞ্জনের ওয়াইফ। গ্রাফিক্স ডিজাইনার। তৃণাঞ্জন খেতে খেতে বলে, ''কুর্চির রাগ করাটা খুব স্বাভাবিক। তুই সামান্য একটা স্বপ্নকে নিয়ে বড় বেশি ভাবছিস!''

— ''ভাবতাম না যদি স্বপ্নটা শুধু একদিন দেখতাম। কিন্তু আমি যে বারবার—।''

তৃণাঞ্জন ঠাট্টার সুরে বলে, ''তোর আবার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ছে না তো?''

— ''পূর্বজন্ম! ঠাট্টা করছিস? জানতাম। তুইও বিশ্বাস করবি না।''

তৃণাঞ্জন আশ্বাসের সুরে বলে, ''তা নয় বিতান, এমন অনেক ঘটনাই পৃথিবীতে ঘটে যার কোনও লজিক নেই। তা না হলে তুই বা ওই একই স্বপ্ন বারবার দেখবি কেন? যাই হোক, অত ভাবিস না। তোর রেস্ট দরকার। শারীরিক, মানসিক। আমি তোর ওয়েল উইশার হিসেবেই বলছি, তোরা দূরে কোথাও ঘুরে আয়। ভালো লাগবে। কাজের চাপে একে অপরকে সময় দিতে না পারায় যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছে, সেটাকে নিজেদেরই মিটিয়ে ফেলতে হবে। এটা সব দাম্পত্যেরই কমন প্রবলেম।'

কথাটা মনে ধরে বিতানের। বলে, ''মন্দ বলিসনি! অনেকদিন কোথাও যাওয়াও হয়নি। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?''

— ''সেটা নিজেরা ডিসাইড কর। কেমন জায়গা তোদের পছন্দ, কুর্চির সঙ্গে ডিসকাস কর। এখন চল, বাড়ি ফেরা যাক।''

বলেই বিল মিটিয়ে নেমে এলো ওরা। বিতানের গাড়ি অফিসে রাখা ছিল। তাই ওকে সেখানে ড্রপ করে তৃণাঞ্জন বেরিয়ে যায়। বিতানও নিজের গাড়ি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যায় তাদের সাদার্ন অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে।

৪

কুর্চি বিকেলের মধ্যেই ফিরে গিয়েছিল। সেদিন যে কোনও কারণেই হোক কুর্চির মুড খুব ভালো ছিল। বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে একটা সেন্টেড ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে ক্লাসিক্যাল মিউজিক চালিয়ে দিল। কফি বানিয়ে সদ্য ইজি চেয়ারে হেলান দিয়েছে অমনি কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই কুর্চিকে দেখে

অবাক হয়ে গেল বিতান। প্রসন্ন মেজাজে তার এই গুরুগম্ভীর অধ্যাপক বউটিকে বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। পরনে ভায়োলেট কালারের নাইট স্যুট। ভেতরের আলো আঁধারি ঘর থেকে ভেসে আসছে হালকা মিউজিক। বিতানের মনে নেশা ধরে গেল। সে খাবারের প্যাকেটটা ডাইনিং টেবিলে রেখে চট করে ফ্রেশ হয়ে চলে এল কুর্চির কাছে। আজ তৃণাঞ্জনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার মনটাও বেশ ভালো হয়ে গেছে। কাছে আসতেই কুর্চি জড়িয়ে ধরল বিতানকে। বিতানের বুকে মাথা রেখে আবদারের সুরে বলল, ''চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি। এই একঘেয়েমি জীবন আর ভালো লাগছে না।''

বিতান কুর্চিকে আরও কাছে টেনে বলল, ''আমার মনের কথা তুমি কী করে বুঝলে বলো তো? আমিই তো আজ তোমাকে এই প্রস্তাব দিতাম।''

কুর্চি বিতানের নাকটা টিপে দিয়ে বলল, ''আমি যে তোমার বউ মশাই। আমি সব বুঝতে পারি।'

— ''কিন্তু কোথায় যাবে সেটা তো আগে ঠিক করতে হবে।''

— ''কোথায় আবার, নিজেই তো রাতদিন পাহাড়ের স্বপ্ন দেখছ। তার মানে পাহাড় তোমাকে ডাকছে। পাহাড়েই যাব।''

কথাটা শুনে চমকে উঠে বিতান। মনে পড়ল সেই স্বপ্নের কথা। ''পাহাড় ডাকছে!''

— ''কী বিড়বিড় করছ বলো তো? অমনি স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল? তুমি নিশ্চয়ই গত জন্মে পাহাড়ে থাকতে। এই জন্মে কলকাতায়। আর যে মেয়েটাকে দ্যাখো সেটা তোমার গত জন্মে বউ ছিল।'' বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ে কুর্চি। কিন্তু বিতানের হাসি পায় না। এই একই কথা কিছুক্ষণ আগে তার বন্ধু তৃণাঞ্জনও বলেছে। সে কথা চেপে গিয়ে বিতান বলে, ''তা হলে ঠিক করো কোথায় যাবে! কারণ ট্রেনের টিকিট কাটা থেকে হোটেল বুকিং —অনেক কাজ আছে।''

— ''সে তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমার কলেজে এক ট্র্যাভেল এজেন্ট আছে। তাকে বললে সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে।''

— ''কিন্তু যাবে কোথায় বলো? তোমার তো আবার সব হিস্টরিক্যাল প্লেস পছন্দ।''

— ''হ্যাঁ। সে পছন্দ হলেও আমার অনেক দিনের ইচ্ছে কোনও ইংরেজ সাহেবের বাংলোতে থাকার। আমি সে কথা তোমাকে এর আগেও বলেছি। ইংরেজদের বাড়ির স্থাপত্য আমার খুব ভালো লাগে। তা ছাড়া ইংরেজ সাহেবের বাংলো নিয়ে অনেক গল্প পড়েছি।'' বলতে বলতে কুর্চি কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

বিতান কুর্চিকে জড়িয়ে ধরে বলে, ''সবই তো বুঝলাম ম্যাডাম। কিন্তু সেই বাংলো আছে কোথায়?''

— ''আছে মশাই। কালিম্পংয়ে এ রকম কয়েকটা বাংলো আছে। তার মধ্যে একটা মরগ্যান হাউস।''

'মরগ্যান হাউস' নামটা কোথায় যেন শুনেছে বিতান। কুর্চি বলে,''কিন্তু ছ'মাস আগে বুকিং না করলে নাকি পাওয়া যায় না। দেখি ট্র্যাভেল এজেন্টকে বলে। শুনেছি মরগ্যান হাউসে নাকি ভূত আছে। তুমি নেটে একবার বাড়িটা দেখবে?'' বিতান আদুরে সুরে বলে, ''না ম্যাডাম। একেবারে স্পটে গিয়েই দেখব। এখন আমার বউটাকে একটু দেখি।''

৫

পরের দিন থেকে দু'জনেই যেন নতুন করে কাজের এনার্জি পেল। বেড়াতে যাওয়ার ভাবনাটা দু'জনের অনেক দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে।

ওদের ভাগ্য ভালো ছিল। তাই দিন কয়েকের মধ্যেই মরগ্যান হাউসের বুকিং ও ট্রেনের টিকিট পেয়ে গেল। যেদিন থেকে যাওয়ার ডেট ফাইনাল হয়েছে, সেদিন থেকে বিতানের মধ্যে সেই ছটফটানিটা অদ্ভুত ভাবে কমে যেতে থাকে। অনেক বছর পর প্রিয়জনের কাছে ফিরলে যেমন এক অদ্ভুত আনন্দ হয়, বিতানের মনের অবস্থাও কিছুটা সেই রকম।

তার পর চলল প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজ। অফিস থেকে ছুটি নেওয়া, কুর্চির সিএল অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়া, শপিং করা, খাবারদাবার কেনা, গরম পোশাক কেনা, প্যাকিং ইত্যাদি। শপিং সেরে ফেরার সময় কুর্চি বলে, ''দ্যাখো, পাহাড়ে গিয়ে আমি কিন্তু জিন্স পরব। কলেজে তো রোজই

শাড়ি পরে যেতে হয়।''

বিতান ড্রাইভ করতে করতে হেসে বলে, ''তুমি কি আমার পারমিশনের তোয়াক্কা করো? যখন যেটা ইচ্ছে হয়, করো। তবে তোমাকে শাড়ি পরলে ভালো লাগে।''

বিতানের কথাটা শুনে কুর্চির মাথা গরম হয়ে গেলেও সে তা প্রকাশ করে না। কারণ বেড়াতে যাওয়ার আগে কোনও অশান্তি করার পক্ষপাতী সে নয়। অবশেষে সেই দিন আসে। প্যাকিংটা আগেভাগেই করে রেখেছিল কুর্চি। তাই বেড়াতে যাওয়ার দিন সকাল থেকে নানা খাবার তৈরিতে সে ব্যস্ত। রাতের খাবারটা আগেই বানিয়ে নিয়েছিল। চিকেন কষা আর ভেজ পোলাও। বিতান কিনে এনেছিল ভীম নাগের কড়া পাকের সন্দেশ। ট্রেনে সকালে ভালো ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায় না। তাই কুর্চি কিছু স্যান্ডউইচও বানিয়ে ফয়েলে প্যাক করে নিয়েছিল। অবশ্য সব কাজেই বিতান কম-বেশি সাহায্য করেছে কুর্চিকে।

তবে বিতানের সাংসারিক কোনও কাজই ঠিক পছন্দ হয় না কুর্চির। বড্ড বেশি এলোমেলো। কুর্চি নিজে ডিসিপ্লিন মেনে চলতে ভালবাসে। অথচ বিতান যেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। এক-এক সময় কুর্চির মনে হয় বিয়েটা না করলেই বোধ হয় ভালো হত। অন্তত জীবনকে একটা সুযোগ দেওয়া যেত। কোথাও যেন ঠিক মেলে না বিতানের সঙ্গে। এ-সব ভাবতে ভাবতেই ট্রেনের সময় হয়ে আসে। শিয়ালদা স্টেশন থেকে রাত্রি সাড়ে আটটায় কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। নিজেদের গাড়িগুলো গ্যারেজে রেখে একটা ক্যাব নিয়েই বেরিয়ে পড়ে ওরা। ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছেই দ্যাখে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দিয়ে দিয়েছে। দুটো মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনে ওরা উঠে পড়ে ট্রেনে।

নভেম্বর শেষ হতে চলেছে। এ বছর কলকাতায় ঠান্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। তবে বেড়ানোর পক্ষে এটাই আদর্শ সময়। ওদের টিকিট ছিল এসি টু টিয়ারে। সাইড আপার আর সাইড লোয়ার। কুর্চির লোয়ার বার্থ পছন্দ। তবে যতক্ষণ না শোয়া হয়, ততক্ষণ দু'জনে একসঙ্গে লোয়ার বার্থে মুখোমুখি বসে পড়ে।

জ্যোৎস্না রাত। কয়েকদিন পরেই পূর্ণিমা। তবে স্টেশনের এত জোরালো আলোতে চাঁদের আলো বোঝা মুশকিল। তাও আবার এত পুরু কাঁচের ভেতর।

কুর্চি বলে, ‘‘বর্ধমান পেরিয়ে খানা জংশন থেকে ট্রেনটা যখন বোলপুরের দিকে যাবে, তখন পারলে দরজার কাছে গিয়ে বাইরের প্রকৃতিটা দেখতে পারো। বীরভূমের ওই দিগন্ত বিস্তৃত রুক্ষ মাঠ ভিজে যাচ্ছে জ্যোৎস্না ধারায়। গাছে গাছে জোনাকিদের রংমশাল।’’ বলতে বলতে কোথায় যেন হারিয়ে যায় কুর্চি। চোখের সামনে যেন সব দেখতে পাচ্ছে।

বিতান বলে, ‘‘বাব্বা। ইতিহাসের অধ্যাপিকা যে আজ সাহিত্যিক হয়ে গেল!’’

কুর্চি আনমনে বলে, ‘‘কেন? ইতিহাস নিয়ে পড়লে বুঝি সাহিত্যকে ভালবাসা যায় না?’’

বিতান জানত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অযথা খানিক কথা কাটাকাটি হবে। তাই সে প্রসঙ্গ চেঞ্জ করে বলে, ‘‘আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।’’

কুর্চি বলে, ‘‘ট্রেনটা ছাড়ার পরই আমরা ডিনার করব।’’

৬

খাওয়াদাওয়া সেরে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রেনের দুলুনিতে বিতানেরও ঘুম এসে গিয়েছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ ট্রেন না চলায় বিতানের ঘুম ভেঙে যায়। আপার বার্থে শুয়ে বিতান ভাবে, নিশ্চয় কোনও স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন সে নীচে নামে। পর্দা সরিয়ে জানলা দিয়ে দেখে বাইরেটা অন্ধকার। রাত তখন প্রায় বারোটা। ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। কুর্চির কোনও হুঁশ নেই। সে গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে পরমানন্দে ঘুমোচ্ছে। ব্যাপারটা কী দেখার জন্য দরজার কাছে এসে দেখল সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেন বোলপুর স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ বীরভূম ঢুকে গেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল কুর্চির কথা। কুর্চি তো জ্যোৎস্না আলোয় ভেজা রাতে বীরভূমের কথাই বলেছিল। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। যেন এক নিঝুম পুরিতে ট্রেনটা এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে একমাত্র জীবিত বিতান। ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় দ্যাখে বিঘার পর বিঘা শুকনো ধান মাঠ আকাশের ওই চাঁদটার মতোই একাকিনী। অধীর আগ্রহে কার জন্য যেন প্রতীক্ষা করছে। বিতানের মনে হয়, আগেও তো সে এখানে এসেছে। এখানেই

তো আসার কথা ছিল তার। গাছে গাছে জোনাকি নিভছে জ্বলছে। সামনের ওই ছোট্ট পুকুরে চাঁদের আলো সে আগেও যেন দেখেছে।

ট্রেন সিগন্যাল পেয়ে তখন আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে। বিতান যেন কোথায় হারিয়ে যায়। বোলপুর স্টেশন পেরিয়ে যেতে যেতে প্ল্যাটফর্মের ওপর হঠাৎ সে এক ঝলক দেখতে পায় স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটিকে।

চিৎকার করে নামতে যায়, এমন সময় পেছন থেকে হ্যাঁচকা টানে বেসামাল হয়ে সম্বিত ফিরে পায় বিতান। দেখে এক আরপিএফ তার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, ''কী করছিলেন আপনি? আর একটু হলেই তো কাটা পড়তেন। ব্যস, খেল খতম। আত্মহত্যা করারই যদি সখ হয়, তা হলে নিজের বাড়িতে গিয়ে করুন। এই রাত-দুপুরে আমাদের আর কাজ বাড়াবেন না। —যত্তসব। ভাগ্যিস আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। তা ছাড়া কাকে দেখে আপনি এই সুপারফাস্ট চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গেলেন? মাথায় গন্ডগোল আছে নাকি?'' বলেই আর কোনও উত্তর শোনার অপেক্ষা না করে দরজা লক করে অন্যদিকে চলে গেল।

বিতান কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। নিজের কাজে নিজেই অবাক হয়ে যায়। এসব কী হচ্ছে তার সঙ্গে! কুর্চি শুনলে আর রক্ষে থাকবে না। টয়লেট সেরে চোখে-মুখে জল দিয়ে নিজের বার্থে গিয়ে শুয়ে পড়ে বিতান। ঘুম ভাঙে একটু দেরি করে। ট্রেন তখন রাঙাপানি পেরিয়েছে। গত রাতে সিগন্যাল না থাকায় ট্রেন প্রায় দু'ঘণ্টা লেট। সঙ্গে কুয়াশা তো আছেই। নীচের বার্থ থেকে কুর্চির উচ্ছ্বসিত আনন্দের ডাক ভেসে আসে, ''এই বিতান, নেমে এসো। দ্যাখো-দ্যাখো, চা বাগান পেরোচ্ছে।''

বিতান ঘুম চোখে ধড়মড় করে নেমে এসে জানলার কাছে বসতেই দ্যাখে, দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ চা বাগানের মধ্যে দিয়ে তারা চলেছে। এমন দৃশ্য দেখলে যে কোনও মানুষের মনই ভালো হয়ে যাবে। কুর্চি শিশুর মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সকালের আলোয় কুর্চিকে বেশ ঝকঝকে লাগছিল। এত উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বল কুর্চিকে শেষ কবে দেখেছে মনে নেই বিতানের। শাড়ি আর চশমা পরা অধ্যাপকের আপাত গাম্ভীর্যের আড়ালে কোথায় বাস করত এই প্রাণবন্ত মেয়েটি! থ্যাঙ্কস টু তৃণাঞ্জন। সে এই

আইডিয়াটা না দিলে বেড়াতে আসাই হত না। আসলে সব মানুষের জীবনে একটা ব্রেক দরকার। প্রকৃতির কাছে এলে মানুষ নিজেকে জানতে পারে, অজানাকে চিনতে পারে।

কুর্চির দিকে তাকিয়ে বিতানের মনে পড়ে যায় গত রাতের কথা। গতকাল রাতে যা ঘটল তা কি নেহাত মনের ভুল? আত্মহত্যার কথা তো সে কোনওদিন কল্পনাও করেনি। তা ছাড়া সে আত্মহত্যা করতে যাবেই বা কেন? আর ওই মেয়েটা? যাকে সে প্রায় দিন স্বপ্নে দ্যাখে? তাকে বোলপুর স্টেশনে কীভাবে দেখল? বাড়িতেও তো ওই রকম মাঝরাতেই মেয়েটিকে স্বপ্ন দেখে সে। মাথাটা কাজ করে না বিতানের। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? ভাগ্যিস ওই আরপিএফ কুর্চিকে চেনে না। না হলে কেলেঙ্কারির শেষ থাকত না!

বিতান ফ্রেশ হয়ে এসেই দ্যাখে কুর্চি ব্রেকফাস্ট রেডি করে ফেলেছে। স্যান্ডউইচ, আপেল আর কিছু ড্রাই ফ্রুটস। এসব ব্যাপারে কুর্চি বেশ পারফেকশনিস্ট। চাওয়ালার কাছ থেকে দু'কাপ কফি নিয়ে যখন ব্রেকফাস্ট শেষ হল, তখন ট্রেন এনজিপি ঢুকে গেছে। কিন্তু তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টি দেখে দু'জনেরই মন খারাপ হয়ে গেল। অন্য সময় বৃষ্টিকে ভালো লাগলেও বেড়াতে এসে বৃষ্টি কারই বা ভালো লাগে! তার পরে আবার শীতকালে। লাগেজ পত্তর বার করে ওরা ধীরে সুস্থে নেমে স্টেশনেই অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় কুড়ি মিনিট পর বৃষ্টি থামল। ওরা স্টেশনের বাইরে আসতেই দেখল প্ল্যাকার্ড হাতে এক নেপালি স্মার্ট তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তাতে লেখা, ''ওয়েলকাম মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সেন''। ট্র্যাভেল এজেন্টই গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। বিতানরা তার কাছে এগিয়ে যেতেই সেই তরুণ ড্রাইভার ওদের ব্যাগপত্তর গাড়িতে রেখে স্টার্ট দিল।

৭

এক পশলা বৃষ্টির পর বেশ ঝকঝকে রোদ উঠেছে। রাস্তায় রাস্তায় জল জমে আছে। গাড়িটা জ্যাম রাস্তাঘাট পেরোনোর পর একটু ফাঁকা জায়গায় যেতেই ড্রাইভারকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করে কুর্চি, ''তোমার নাম কী ভাই?''

— ''জি মেরা নাম রোশন।''

— ''বাহ্! খুব সুন্দর নাম তোমার রোশন।''

— ''থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।''

— ''আচ্ছা রোশন, আমরা এখানে ফার্স্ট টাইম এলাম। রাস্তায় দর্শনীয় যা কিছু আছে, তুমি একটু দেখিয়ে দেবে। আর তোমার গাড়িতে যদি গান থাকে চালাতে পারো।''

— ''জি ম্যাডাম। জরুর।'' বলেই রোশন কিশোর কুমারের হিন্দি গান চালিয়ে দেয়। গান শোনানোর ক্ষেত্রে রোশনের টেস্ট বেশ ভালো। যে ট্র্যাভেল এজেন্ট রোশনকে গাড়ির জন্য বুকিং করে, তার কাছ থেকে আগে ভাগেই প্যাসেঞ্জারের বয়স এবং পেশা সম্পর্কে জেনে নেয়। সেই অনুযায়ী গানের কালেকশন রেডি থাকে তার গাড়িতে। প্যাসেঞ্জারকে সব রকম সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিতান কুর্চির পাশে বসে তাদের কথোপকথন শুনছিল। গাড়িতে ওঠার পর থেকে সে ভয়ঙ্কর রকম চুপ হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। কারণ এনজিপিতে নেমেই বিতানের একটা অদ্ভুত ফিলিংস হচ্ছে। যেন বহু যুগ পর সে বাড়ি ফিরছে। বিদেশে অনেক বছর কাটিয়ে কোনও মানুষ যখন তার প্রিয়জনদের কাছে ফিরে আসে, তখন যেমন আনন্দ হয়, বিতানের আনন্দও যেন কিছুটা সেই রকম।

মনে হচ্ছে এখানেই যেন তার বাড়ি। তার জন্য অধীর আগ্রহে কেউ পথ চেয়ে বসে আছে বহু বছর। আরও একটু এগিয়ে গেলেই যেন সে তার বাড়ি, তার প্রিয়জন সকলকেই ফিরে পাবে। অনেক দিনের জমে থাকা কথা বলতে পারবে। অথচ এখানে সে আগে কখনও আসেনি। কুর্চিকে সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য জায়গায় গেলেও পাহাড়ে আসা হয়নি। বিশেষত উত্তরবঙ্গে। আর অত বেড়ানোর সময়ই বা কোথায়! দু'জনেই কর্মজগতে চরম ব্যস্ত। কিন্তু এই শহরে পা দিতেই বেশ নিশ্চিন্ত লাগছে বিতানের। যেন কতদিনের চেনা শহর! এই ভিড় এই যানজটের মধ্যে সে হেঁটে গেছে বহুবার। কিন্তু তার বাড়ি তো আসানসোলে। বড় হয়ে ওঠাও সেখানেই। এমনকী, মা-বাবার সঙ্গেও কখনও

উত্তরবঙ্গে আসেনি। ক্রমশ এক জটিল চিন্তার স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকে বিতান। ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। প্রশ্ন অনেক। কিন্তু উত্তরগুলো অমীমাংসিত।

গাড়িটা তখন শহরের যানজট ছাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তা ধরেছে। কুর্চি বিতানকে একটু ঠেলা মেরে বলে, ''এই তোমার বন্ধু তৃণাঞ্জনকে একটা ফোন করো না? আফটার অল ওর জন্যই তো আমাদের আসা হল।''

বিতান যন্ত্রচালিতের মতো পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডায়াল করতেই কেটে গেল। 'নো নেটওয়ার্ক'। কুর্চি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বিতানের হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে তৃণাঞ্জনকে ডায়াল করতে করতে বলল, ''কী যা তা বলছ? এখন অল ইন্ডিয়াতে এত স্ট্রং নেটওয়ার্ক আর এখানে নেই!'' কিন্তু ফোন আবার কেটে গেল।

সামনের সিট থেকে রোশন বলে, ''ম্যাডাম আভি নেটওয়ার্ক নেহি মিলেগা। মহানন্দা রিজার্ভ ফরেস্ট শুরু হো গেয়া। ফরেস্ট কে অন্দর নেটওয়র্ক কাম নেহি করতা, অউর ইয়ে ফরেস্ট খতম হোনে মে আধা ঘণ্টা লাগ জায়েগা।''

কুর্চি রোশনের কথা শুনে ফোনটা বিতানকে দিয়ে জানলায় মুখ রাখে। দু'পাশে কী গভীর জঙ্গল! পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল সব কিছুকেই বড় রহস্যময় মনে হয় কুর্চির। আসলে প্রকৃতি নিজেই তো রহস্যময়ী। ওই গভীর জঙ্গলের ভেতর কত অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে!

গাড়ির জানলা খুলে দিতেই একরাশ ঠান্ডা জোলো বাতাসের ঝাপটা লাগে কুর্চির চোখে-মুখে। হঠাৎ বিতানের দিকে চোখ পড়ে কুর্চির। সে তার পাশেই বসে রয়েছে। অথচ যেন পাশে নেই। রয়েছে অনেক অনেক দূরে, যেখানে কুর্চি কোনওদিন পৌঁছতে পারবে না। কুর্চির ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর রাগ হয়, ''কী ভাবছ বলো তো তখন থেকে? কথা নেই বার্তা নেই। আশ্চর্য! এখানেও তুমি ওই স্বপ্নের রাজকন্যাকে নিয়ে ভেবে যাচ্ছ, তাই তো? আগে পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছোও। তার পর না হয় সেই বাড়ি, আর সেই রাজকন্যাকে খুঁজে বেড়িও।''

কুর্চির এই জ্বালাভরা কথায় বড় আহত হয় বিতান। সে কী ইচ্ছে করে—!

কিন্তু কুর্চিকে সে কথা বলে লাভ নেই। ও বিশ্বাসই করবে না। হয়তো বা ঠাট্টা করবে। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, সে এতক্ষণ সেই স্বপ্নের কথাই ভাবছিল। শুধু

স্বপ্ন হলেও বা ঠিক ছিল। কিন্তু তার সব কিছু এত চেনা চেনা মনে হচ্ছে কেন? বিতানের ভাবান্তর দেখে কুর্চি আবার খেপে যায়, ''তুমি ভেবে যাও, ভেবে যাও। জাস্ট ক্যারি অন। রাস্তা শেষ হলে আমি বাস্তবে ফিরিয়ে দেব কেমন? এ–সব লোকের সঙ্গে কেউ বেড়াতে আসে!''

বিতান প্রমাদ গোনে। সে কুর্চির রাগকে চেনে। এটা একটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র। নিজেকে সংযত না করলে দাবানলের আকার নিতে বেশি সময় লাগবে না। ভেতরে ভেতরে কষ্ট পায় কুর্চির কথায়। গাড়িতে বাজতে থাকে কিশোরের গান, 'জিন্দেগি কি সফর মে গুজর যাতে হ্যায় যো মোকাম, বো ফির নেহি আতে।' গানের সুর ও কথা বিতানের মনকে আরও বিষন্ন করে দেয়। সে জানে সে যা আচরণ করছে, তা স্বাভাবিক নয়। কুর্চির জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ভাবে বিতান। আজ সে যদি আমার সঙ্গে এমন আচরণ করত, তা হলে আমিও একই রকম বিরক্ত হতাম। হয়তো। হয়তো বা আরও একটু সংবেদনশীল হয়ে কুর্চির ভেতরের কথা জানতে চাইতাম। যদি বলত তা হলে নিজের মতো করে সলভ করার চেষ্টা করতাম। একা একা কষ্ট পেতে দিতাম না। ভালবাসি বলেই হয়তো—।

ভালবাসি? নিজেকে প্রশ্ন করে বিতান। সত্যি কি সে ভালবাসে কুর্চিকে, নাকি একই ছাদের তলায় থাকার ফলে ভালবাসাটা একটা অভ্যেসে পরিণত হয়ে গেছে? আচ্ছা বিয়ে করলে কেন মানুষের সব স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়? নিজের মতো কোনও কিছু করার, নিজের মতো করে ভাবার অধিকার কেন থাকে না? কেন সর্বক্ষণ একে অপরের পছন্দ অপছন্দের দিকে খেয়াল রাখতে হয়? স্বামী স্ত্রী একে অপরকে ভয় পায় কেন?

মানুষের মুড কী বিচিত্রভাবে সুয়িং করে! এই ভালো, তো এই মন্দ। অনেকটা শরতের আকাশের মতো। কখনও রোদ কখনও বৃষ্টি। মানুষের জীবনটাও প্রকৃতির মতোই।

৮

শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং যাওয়ার রাস্তাটা বড় সুন্দর। সমস্ত পথ জুড়ে ওদের

সঙ্গী হয়ে চলতে থাকে সুন্দরী তিস্তা। করোনেশন ব্রিজের কাছাকাছি আসতেই রোশন বলে, ''সামনেহি ম্যাডাম করোনেশন ব্রিজ হ্যায়। আপ অউর স্যারজি ফোটো লেঙ্গে?''

কুর্চির মাথা গরম থাকায় রোশনের কথার উত্তর না দিয়ে নিজের ফোন বের করে গুগল করে নেয়। এখানে অবশ্য ফুল নেটওয়র্ক। গুগল জানায়, করোনেশন ব্রিজ ১৯৩৭ সালে রাজা ষষ্ঠ জর্জ ও রানি এলিজাবেথের যখন রাজ্যাভিষেক হয়, তখন সেই মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য স্মারক হিসেবে ভারতে তৈরি হয়েছিল এই করোনেশন ব্রিজ। কমপ্লিট হয়েছিল ১৯৪১-এ।
কিছুটা দূর যাওয়ার পর কালিঝোরা আসতেই রোশন বলে, ''ইয়ে কালিঝোরা হ্যায় ম্যাডাম, যাহা বচ্চন সাহাবনে শুটিং কিয়া।''
দু'জনেই চুপচাপ শুনে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পরই কুর্চি বলে, ''একটা ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড় করাও তো গাড়িটা। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। সেই কোন সকালে একটু ব্রেকফাস্ট করেছি। কত বেলা হয়ে গেল! লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে। কখন পৌঁছব কে জানে!''
— ''জি ম্যাডাম। কালিম্পং মে কারেঙ্গে?''
কুর্চি কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই বিতান বলে ওঠে, ''আরে না-না। কিছুটা এগোলেই একটা টার্নিং পাবে। সেখানে গাছের তলায় একটা ঝুপড়ি দোকান আছে। দারুণ মোমো বানায়। ওখান থেকে তিস্তার ভিউটা দারুণ দেখা যায়।''
কথাটা বলেই বিতান কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল।
কুর্চিও কম অবাক হয়নি। বিস্ময় আর সন্দেহ ভরা গলায় ওর দিকে তাকিয়ে বলে, ''টার্নিং পেরিয়ে যে মোমোর দোকান আছে, তা তুমি জানলে কেমন করে? তুমি কি আগে এসেছিলে? অথচ আমাকে তো এত বছর ধরে বলে আসছ তুমি নাকি কোনও দিন উত্তরবঙ্গ আসোইনি!'' শ্লেষ মেশানো হাসি হেসে আরও বলল, ''দেখলে তো সত্যি কোনও দিন চাপা থাকে না। সে ঠিক বেরিয়ে পড়ল। সত্যিটা আমাকে বলে দিলেই পারতে!''
বিতান এই কথার উত্তরে কী বলবে খুঁজে পায় না। বাইরের লোকের সামনে কুর্চি এমন আচরণ করছে! অথচ সে তো সত্যিই কোনও দিন উত্তরবঙ্গ আসেনি!

তা হলে মোমোর দোকানের কথা জানল কেমন করে। রোশন হেসে বলে, ''আপনে বিলকুল ঠিক কাহা স্যারজি। আগে কি রাস্তেপে এক বহত পুরানা দুকান হ্যায়। বহত সাল পুরানা দুকান। হাম যব ছোটে থে তো পাপা কে সাথ আতেথে উস দুকানপে। তব এক মসি বহত আচ্ছা মোমো বানাতি থি। আভি বো বুঢ়া হো গেয়া। আব উসকি পোতি দুকান সামহালতা হ্যায়।''

কুর্চির এসব ইতিহাস শুনতে মোটেই ভালো লাগছিল না। সে বিরক্ত গোপন করে বলে, ''চলো, চলো। পোতিই বানাক আর পোতাই বানাক, আমার একটু খাবার হলেই চলবে। অত গল্প শুনে কাজ নেই।''

রোশন রাস্তার একধারে গাড়িটাকে দাঁড় করাতেই কুর্চি ও বিতান নেমে যায়। আকাশ বেশ মেঘলা হয়ে আছে। পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ জমেছে। যেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়–বৃষ্টি শুরু হবে। তবে জায়গাটা বেশ সুন্দর। সারি সারি বাঁশ আর পাইন গাছের মধ্যিখানটিতে একটা ছোট্ট দোকান। দোকানের ঠিক পেছনেই একটা রাস্তা নেমে গেছে তিস্তার বুকে। অনায়াসেই তিস্তার জলে স্নান করে আসা যায়।

এতটা জার্নি করার পর এমন একটা জায়গায় এসে কুর্চির মন কিছুটা হলেও শান্ত হল। তার মনে বিরক্তির যেটুকু মেঘ জমেছিল এক পশলা ঠান্ডা হাওয়া এসে তা কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। বিতানের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কষ্ট পেল কুর্চি। বেচারাকে বেড়াতে এসেও অযথা চারটে কথা শোনানো উচিত হয়নি। সে মুখে স্যরি না বলে বিতানের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় দোকানে। বিতান যেতে যেতে রোশনকেও ডেকে নেয়।

দোকানে একটা ১৫–১৬ বছরের সুশ্রী মেয়ে বসে বসে টিভি দেখছিল। কাস্টমার আসতে দেখেই উঠে দাঁড়ায়। কুর্চি খাবারের অর্ডার দেয়। ম্যাগি আর চিকেন মোমো। মোমোটা যেহেতু গরমই ছিল। তাই সেটাই আগে দিয়ে দেয় সেই মেয়েটি। সঙ্গে গরম গরম স্যুপ।

মোমো মুখে দিয়েই অবাক হয়ে যায় কুর্চি। এত টেস্টি মোমো সে আগে কখনও খায়নি! সে কথা মেয়েটিকে বলতেই মেয়েটি জানাল, সে নিজে এটা বানায়নি। বানিয়েছে তার দিম্মা। কুর্চির কথা শুনে বিতানও খেতে শুরু করে। কিন্তু মোমোতে এক কামড় দিতেই সেও কেমন যেন চমকে

যায়। সেই হুবহু এক টেস্ট! কোথায় যেন খেয়েছে! এই দোকানে আগেও তো সে— ব্যস। তার পর সব হারিয়ে যায়। আর কিচ্ছু মনে পড়ে না বিতানের। তার কি অ্যালঝাইমার হয়েছে? বারবার কেন মনে হচ্ছে আগেও সে এখানে এসেছে। এখানে খেয়েছে। অথচ তার পর সব ব্ল্যাঙ্ক। একেই পাহাড়ের এত টার্নিং। তার পর মনের মধ্যে বয়ে চলা একটা ঝড়। সে মোমোটা খেলেও ম্যাগিটা আর খেতে পারে না। তার কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে। বমি করে যদি একটু ফ্রেশ লাগে, সেইজন্য দোকানের পাশে ফাঁকা জায়গাটায় গেল। সেখান দিয়ে নদীতে নামার রাস্তাটা শুরু হয়েছে। রাস্তার পাশে একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়ায় বিতান। তার নীচ দিয়েই বয়ে চলেছে তিস্তা। গলায় আঙুল দিয়ে কিছুটা বমি করার পর তার চোখ যায় সেই রাস্তার দিকে। দেখে নদীর নীচের ওই রাস্তা ধরে উঠে আসছেন সদ্য স্নাতা এক অশীতিপর নেপালি বৃদ্ধা। কুঁজো হয়ে যাওয়ায় হাঁটতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। হাতে লাঠি। উপরে উঠে বিতানকে দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে আসেন। হাসি হাসি মুখে নড়বড়ে গলায় বলে ওঠেন, ''সাহাব আপ? ইতনে দিনো কে বাদ? ক্যায়সে হ্যায় আপ?''

বৃদ্ধার চোখের দিকে তাকিয়ে এবং তার এই কথা শুনে বিতানের হঠাৎ কারেন্ট লাগার মতো অবস্থা হয়। তার মাথা ঘুরতে থাকে। আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল সেই গভীর তিস্তার জলে, যদি না রোশন এসে তাকে ধরে নিত।

— ''ক্যায়া হুয়া স্যারজি? তবিয়ত খারাব হ্যায়? চলিয়ে, উস মসিকি দুকানপে থোড়াসা রেস্ট লেলিজিয়ে। ভগবানকা সুকর হ্যায় কে আপ গিরতে গিরতে বাঁচ গ্যয়ে।''

— ''না, আমি ঠিক আছি। কিছু হয়নি। কিন্তু ওই মাসি কে? উনি কি আমাকে চেনেন? আমাকে বললেন, ইতনে দিনো কে বাদ!''

সেই বৃদ্ধা ততক্ষণে দোকানে পৌঁছে গেছেন। রোশন হাসতে হাসতে বলে, ''বো ফুলি মসি? উসকি বাত ছোড়িয়ে। ইতনা উমর হো গিয়া। কিসিকো ভি কুছভি বোল দেতে হ্যায়। আপ টেনশন মত লিজিয়ে।''

ফুলি মাসি? নামটা কোথায় যেন শুনেছে বিতান! ভাবনাটাকে আর পাত্তা না

দিয়ে দোকানে ফিরে আসে। কুর্চি এসবের কিছুই জানতে পারে না। সে তখন আয়েশ করে ডবল ডিমের অমলেট আর কোল্ডড্রিংকস খেতে ব্যাস্ত ছিল। বিতান বিলের টাকাটা সেই মাসির হাতে দিতেই রহস্যময় হাসি হেসে তিনি বলেন, ''মেরি হাতোকা মোমো তো আপকো অউর আপকি বিবিকো বহৎ পসন্দ থি না সাহাব? আজ ক্যায়সা লাগা? অউর আপকি বিবি কাঁহা হ্যায়?''
বিতান নিজের মনের ভিতরে তোলপাড় করা হাজারটা প্রশ্নকে জোর করে চেপে রেখে সংযত হয়ে আঙুল দেখায় কুর্চির দিকে, ''ইয়ে মেরি বিবি হ্যায়।''
ফুলি মাসি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কুর্চির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলেন, ''ইয়ে আপকি বিবি হ্যায়?'' গলার স্বর আরও নীচু করে ''তো ফির বো কউন থি'' বলতে বলতে ঘরের ভেতর ঢুকে যান।
কুর্চি সন্দেহের চোখে বিতানের দিকে তাকিয়ে বলে, ''কী বললেন উনি? তার মানে তুমি অন্য কারও সঙ্গে—।''
রোশন কিছু একটা আঁচ করতে পেরে মাঝ পথে থামিয়ে বলে, ''ছোড়িয়ে না ম্যাডাম। মসি পাগল হ্যায়। উসকি বাতোকা বুরা মাত মানিয়ে। চলিয়ে। কাফি দের হো গ্যয়া।''

১০

কুর্চি আর বিতান গাড়িতে উঠে পাশাপাশি বসল ঠিকই, কিন্তু কারও মন থেকেই সন্দেহের ঝড় থামল না। যদিও দু'জনের সন্দেহের প্রকারভেদ আছে। বাকি পথটা কেউ কারও সঙ্গে একটা কথাও বলল না। কালিম্পং বাজার আসা মাত্রই শুরু হল বজ্রপাত-সহ প্রবল বৃষ্টি। সময় তখন দুপুর দেড়টা। কিন্তু চারপাশটা বৃষ্টির সঙ্গে এমন ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে যে, মনে হবে এই সন্ধে নামল বলে। সামনে পেছনে কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির পর্দায় সব ঢেকে গেছে।
এমনিতেই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। তার পর অসময়ে এমন বৃষ্টিতে গাড়ির গতি কমে গেল। পাহাড়ি রাস্তা বৃষ্টি হলে খুব বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তবুও রোশন খুব অভিজ্ঞ ড্রাইভার বলে ওই বৃষ্টির মধ্যেও কোনও রকমে গাড়ি চালাতে লাগল। কালিম্পং থেকে মরগ্যান হাউস মাত্র দশ-

পনেরো মিনিটের রাস্তা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা গেটের কাছে চলে এল। রোশন জানালার কাচ খুলে কেয়ার টেকারকে বলল, 'গেট খোল দো। বুকিং হ্যায়।' কেয়ার টেকার গেট খুলে দিতেই রোশন গাড়িটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে হর্ন বাজাতে থাকে। ভেতর থেকে একজন বয় ছাতা নিয়ে এসে ওদের ব্যাগপত্তর বার করতে লাগল। কুর্চি বয়ের হাত থেকে ছাতা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। বৃষ্টির মধ্যেই মরগ্যান হাউস দেখে অভিভূত হয়ে গেল কুর্চি। পথশ্রমের ক্লান্তি আর বিতানের প্রতি তৈরি হওয়া সমস্ত সন্দেহ এক লহমায় মুছে গেল। যে কোনও জায়গায় যাওয়ার আগে সেই জায়গা নিয়ে গুগলে ভালো করে রিসার্চ করে নেয় কুর্চি। এটা তার বহুদিনের অভ্যাস। যে জায়গায় যাচ্ছে, সেখানকার আদবকায়দা, সংস্কৃতি, লোকাল ফুড এসব জানা থাকলে সুবিধা হয়। বিশেষ করে লোকাল হ্যান্ডিক্র্যাফটস। এসব জিনিস কালেকশনের এক অদ্ভুত নেশা আছে কুর্চির। সে নিজে এলিট সোসাইটির সঙ্গে ওঠাবসা করলেও প্রান্তিক মানুষের প্রতি ওর একটা চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা রয়েই গেছে। সমুদ্র হোক বা জঙ্গল, পাহাড় হোক বা নদী, সেখানকার খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের সঙ্গে কুর্চি বেশ অবলীলায় মিশে যেতে পারে। সে নিজের উচ্চবিত্তের স্ট্যাটাস ঝেড়ে ফেলে তাদেরই একজন হয়ে তাদের জীবনের ইতিবৃত্ত শুনতে পছন্দ করে। তার এই বিশেষ গুণের সন্ধান বিতান অনেক পরে পেয়েছিল। কুর্চির এই গুণ তাদের মধ্যে বন্ডিংটা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে বাড়িটিকে একঝলক দেখে ভুতুড়ে বাড়ি বলেই মনে হবে। কোনও রকম আধুনিকতার প্রলেপ পড়েনি। ধূসর রঙের অনুজ্জ্বল একটা বাংলো। দেওয়ালের গায়ে ঝুরি নেমে তার প্রাচীনত্বকে আরও গৌরব দিয়েছে। কুর্চি এসব দেখতে দেখতে মরগ্যান হাউসের ভেতরে চলে আসে। ওদিকে বিতান এতটাই অন্যমনস্ক ছিল যে, তারা মরগ্যান হাউস পৌঁছে গেছে, খেয়ালই করেনি। রোশন বলে, 'স্যার হামলোগ আ গ্যায়ে।' কুর্চি বয়ের ছাতাটা নিয়ে যাওয়ায় বিতান ছাতার অপেক্ষা না করে ওই বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। মরগ্যান হাউসের দিকে তাকাতেই দূরে কোথায় যেন খুব জোর বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। বিতান বাড়িটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওই বৃষ্টির মধ্যেও তার সারা শরীরে প্রবল বেগে বয়ে চলে উষ্ণ রক্তপ্রবাহ।

তার চোখে ভেসে ওঠে স্বপ্নে এক ঝলক দেখা সেই বাড়িটার ছবি। মনে মনে বিড়বিড় করে বলে, 'এটাই তো সেই বাড়ি! স্বপ্নে দেখা সেই ধূসর রঙের বাড়ি।'

দূর থেকে কুর্চি দেখে বিতান সম্পূর্ণ ভিজে অবস্থায় লনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। কুর্চি চেঁচিয়ে বলে, ''আরে কী করছ ওখানে দাঁড়িয়ে? এত বৃষ্টি পড়ছে! ঠান্ডা লেগে যাবে তো—।''

কুর্চির কথায় বিতান সংবিৎ ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে আসে। কিন্তু কুর্চির কথার উত্তর দেয় না। কুর্চি বলে, ''কী ব্যাপার বলো তো? শীতের বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডাটা লাগাও বেশ করে। তার পর আমাদের বেড়ানোটা মাটি হোক আর কী!''

কুর্চির সব ভালো হলেও কথায় কথায় বড্ড মাথা গরম করে ফেলে। রিসেপশনে গিয়ে যাবতীয় প্রসিডিওর সারা হলে বয় ওদের ওপরের রুমে নিয়ে যায়। তবে বাড়ির বাইরেটা যতটা প্রাচীন ভেতরটা ঠিক ততটাই আধুনিক। ভেতরটা পুরোটাই কাঠের তৈরি। চারদিকে ইংরেজ স্থাপত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। ওপরে এসে রুমটা দেখে দু'জনেরই মন ভালো হয়ে যায়। এমন লাক্সারি রুম যে ইংরেজ আমলের হেরিটেজ বাংলোতে পাওয়া যাবে, তা ওরা ভাবেইনি। বাইরে বৃষ্টি তখন কিছুটা ধরেছে। ওরা ফোন করে রুম সার্ভিসে খাবারের অর্ডার দিয়ে স্নান সেরে নেয়। রুমের সব জানলাগুলো খুলে দেয় কুর্চি। ঠান্ডা জোলো বাতাসের ঝাপটা এসে লাগে কুর্চির শরীরে। দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, ''এখানে এসে আমার তো মনে হচ্ছে আমি কয়েকদিনের জন্য রাজা হয়ে গেছি।''

বিতান কুর্চিকে জড়িয়ে ধরে বলে, ''সে কী? একেবারে রাজা? ফিমেল কুর্চির মেল সংস্করণ! আমি তবে কী তোমার রানি হব?''

কুর্চি বিতানের নাকটা টিপে দিয়ে বলল, ''জানি না যাও। আমার খিদে পেয়েছে।''

কুর্চির সুগন্ধী ভিজে চুল সরিয়ে ঘাড়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বিতান বলে, ''আমারও।''

কুর্চি এক ঠেলা দিয়ে বিতানকে সরিয়ে দেয়, ''অমনি অসভ্যতা শুরু হল!''

আর ঠিক সেই সময়েই কলিং বেল বেজে ওঠে।

বিতান বলল, ''বড্ড বেরসিক। ঠিক সময়েই—।''
কুর্চি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল একজন বয় খাবার নিয়ে এসে হাজির। রুমের ভেতরেই ডাইনিং টেবিল ছিল। বয় তাদের জিরে রাইস আর চিকেন ভর্তা, সঙ্গে স্যালাড সার্ভ করে দিয়ে চলে গেল। সারাদিন পর নেপালিদের হাতের রান্না জাস্ট জমে গেল। খেতে খেতে বিতান বলে, ''তুমি কি খুব টায়ার্ড?''
এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে কুর্চি বলল, ''না। কেন বলো তো?''
— ''এমনিই। আমি বলছিলাম এখন তো বৃষ্টি থেমে গেছে। বিকেলও প্রায় হয়েই এলো। তো এই সময় আমরা না ঘুমিয়ে যদি আশপাশটা একটু বেড়াতে যাই—।''
কুর্চি বলল, ''নিশ্চয়। বেড়াতে এসে আবার ঘুম কী? ঘুমিয়েই তো মানুষের জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে যায়। তা ছাড়া সন্ধের পর থেকে পাহাড় খুব বোরিং। তখন না হয় ঘুমোনো যাবে।''
— ''বেশ, চলো তা হলে।''
রুমলক করে গায়ে গরম পোশাক চাপিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। বিতান কুর্চির কাছে কিছু প্রকাশ না করলেও তার মনে একটা খটকা সবসময় কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল।

১১

নভেম্বর মাসে সাধারণত বৃষ্টি হয় না। কিন্তু পাহাড়ি এলাকা বেশ আনপ্রেডিক্টেবল। মরগ্যান হাউসের ঠিক পাশেই রয়েছে মিলিটারিদের খেলার জন্য বিশাল গলফ কোর্স। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। গলফ কোর্স লাগোয়া রয়েছে মিলিটারি পরিচালিত একটি সুসজ্জিত ক্যান্টিন। সেটাও আবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বন্ধ। বিতান বলে, ''চলো দেখি ক্যান্টিনে কী পাওয়া যায়!''
— ''এই তো কিছুক্ষণ আগে আমরা খেলাম।''
বিতান ক্যান্টিনের গেট খুলে মজা করে বলে, ''আমরা যে খেয়েছি সেটা তুমি আর আমি জানি। ক্যান্টিনটা কি জানে? আমার বাবা বলতেন, বাইরে গেলে একটু বেশি খেতে হয়।''
কুর্চি বিতানের দিকে কপট রাগ মিশ্রিত প্রশ্রয়ের হাসি হেসে একটা চেয়ারে

বসে পড়ে। পাহাড়ের কোলে গলফ কোর্সের মনোরম দৃশ্য দেখতে বেশ ভালো লাগে। তবে রোদের আলোয় আরও ভালো লাগত। কনকনে হিমালয়ান বাতাসের সঙ্গে স্ন্যাক্স সহযোগে ধূমায়িত টমাটো স্যুপ ওরা পরমানন্দে খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। গোটা এরিয়াটা মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট হওয়ায় বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাধারণ লোকের বসবাস নেই। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ। সন্ধের আলো আঁধারিতে বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিতান বলে, ''জানো কুর্চি, এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে। আর একটা দারুণ মনেস্ট্রি আছে। দূরপিন মনেস্ট্রি। কাল সকালে যাবে?''

কুর্চি বলল, ''বাব্বা। এমন করে তুমি বলছ, যেন কতবারই না আগে এখানে এসেছ! তার মানে তুমি যে অন্য কারও সঙ্গে এখানে আগে এসেছিলে, এটা সত্যি। আমি তা হলে তখন এমনিই রাগ করিনি!''

কথাটা বলে বিতান নিজেও অবাক হয়ে গেছে। সকাল থেকে তার সঙ্গে কী যে হচ্ছে! সে তো এর আগে কোনও দিন আসেনি। তা হলে—! কিন্তু সে কথা কুর্চিকে বোঝায় কেমন করে? অনেক কষ্টে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছিল।

বিতানের কথাবার্তায় কুর্চিও বেশ অবাক হয়ে যায়। সে তো অকারণে স্বামীকে সন্দেহ করার মেয়ে নয়। তা ছাড়া বিতান কোনও দিন এমন কোনও কাজ করেনি, যার জন্য তাকে সন্দেহ করতে হবে।

কিন্তু বিতান আজ সকাল থেকে যা কিছু করেছে, তাতে সন্দেহ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সে যদি আগে কারও সঙ্গে এসেছে, তা হলে সেটা বলে দিলেই পারত! কিন্তু গোপন করার ছেলে তো বিতান নয়। তা ছাড়া ওর আচরণে এমন কিছু রয়েছে, যা কুর্চি ঠিক ধরতে না পারলেও একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করছে। কাজেই মাথা গরম না করে ব্যাপারটা কুর্চি চেপে যায়।

মরগ্যান হাউসে আসার, বিশেষত ইংরেজ আমলের বাংলোতে থাকার প্ল্যানটা কুর্চিরই ছিল। কিন্তু এমন বৃষ্টিভেজা স্যাঁতসেতে পরিবেশে মন খারাপ লাগে কুর্চির। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। আলোগুলোও জোরালো নয়। তারা যে পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে, মনে হয় না। একদিনের মধ্যেই যেন কোনও

বিচ্ছিন্ন দ্বীপে চলে এসেছে! এখন সবে সন্ধে সাড়ে ছটা। এই সময় কলকাতার রাস্তাঘাট জনজোয়ারে ভাসে। এখানে যেন প্রাণের স্পন্দন থেমে গেছে। এমন সময় বিতানের মোবাইলটা বেজে ওঠে। তৃণাঞ্জন ফোন করেছে। বিতান ফোনটা রিসিভ করতেই ওপার থেকে তৃণাঞ্জনের গলা ভেসে আসে, ''কী রে, কেমন এনজয় করছিস তোরা? কখন পৌঁছলি? একটা ফোনও করিসনি!''

বিতান শুকনো গলায় উত্তর দেয়, ''করেছিলাম আসার পথে। নেটওয়ার্ক ছিল না।'' বিতান আর কিছু বলার আগেই ফোনটা কেড়ে নেয় কুর্চি। তৃণাঞ্জন বিতানের সূত্রে কুর্চিরও ভালো বন্ধু। তাই ফোনটা কানে নিয়ে বলে, ''একদম ঠিকঠাক সময়ে ফোন করেছ তুমি। না হলে এই বোবা লোকটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যে হারিয়ে যেতাম! তা তোমার বন্ধুটি যে পরকীয়া করছে, সে কথা কি তুমি জানো?''

তৃণাঞ্জন কুর্চির কথায় হেসে বলে, ''অমন সুন্দর বউ থাকতে বিতান করবে পরকীয়া? আই কান্ট বিলিভ কুর্চি। ও কিছু করলে আমি আগে জানতে পারতাম। আফটার অল উই আর বেস্ট ফ্রেন্ড।''

তৃণাঞ্জনের কথায় কুর্চির রাগ কিছুটা প্রশমিত হয়। বলে, ''কেন জানি না ভালো লাগছে না। এত ফাঁকা, এত নিশ্চুপ জায়গায় আগে কখনও তো থাকিনি!''

তৃণাঞ্জন মজা করে বলে, ''কেন কুর্চি? তুমিই তো একদিন বলেছিলে কলকাতার জনঅরণ্য তোমার আর ভালো লাগে না। সব ছেড়ে তুমি নাকি ওই রকম ফাঁকা কোনও জায়গায় চলে যাবে!''

কুর্চি বলে, ''বলেছিলাম। আসলে তখন তো বুঝিনি আমি মানুষের কোলাহল এত ভালোবাসি! মনে হচ্ছে শিয়ালদা স্টেশন থেকে একমুঠো লোক এনে এখানে ছেড়ে দিই। আচ্ছা তৃণাঞ্জন একশো তিরিশ কোটির ভারতবর্ষ এত নির্জন কেন বলো তো?''

ফোনের ওপার থেকে আশ্বস্ত করে তৃণাঞ্জন, ''চিন্তা কোরো না। রাতের অন্ধকারে এমন একটু হয়। সকালে সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে, মন খারাপ কোথায় যেন সব ভ্যানিশ হয়ে গেছে!'' কুর্চি যখন তৃণাঞ্জনের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল তখন একটা আননোন নম্বর থেকে বেশ কয়েকবার কল আসে বিতানের ফোনে। তৃণাঞ্জনের ফোনটা রেখে

দিতেই বিতান সেই নম্বরে কল ব্যাক করে। হিন্দিতে বলে, ''স্যার, মরগ্যান হাউস থেকে বলছি। আপনারা রাতের খাবারের অর্ডার দেননি।'' বিতান বলে, ''ডিনার এত তাড়াতাড়ি? এই তো সবে ছটা বাজে!''

— ''হ্যাঁ, স্যার। আপনাদের খাবার তৈরি করে আমাদেরও তো বাড়ি ফিরতে হবে!''

— ''আসছি।'' বলে বিতান ফোন কেটে দিল। কুর্চিরা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। সেখানে কিছু জনবসতি আছে। ছোট ছোট দোকানপাট রয়েছে। লোকজন ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুর্চির ভূতের ভয় কোনও দিনই ছিল না। তবু তার এই ছোট্ট প্রাণবন্ত বাজারটাকে বেশ ভালো লাগল। যে কোনও কারণেই হোক মরগ্যান হাউসে ফিরতে ইচ্ছে করল না। বিতান কুর্চির মনের ভাব বুঝতে পেরে তার হাতটা শক্ত করে ধরে বলে, ''আমি আছি তো। চলো ফেরা যাক।''

১২

বাজারটা শেষ হওয়ার পর রাস্তাটা বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। দু–একদিন পরই পূর্ণিমা। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় চাঁদের আলো বোঝা যাচ্ছে না। আকাশটা দেখে মনে হচ্ছে আবার বৃষ্টি হবে। এ রকম ঘন অন্ধকারে কথা বলতেও ভয় লাগে। তবে অন্ধকারেরও তো একটা নিজস্ব আলো আছে! কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকলেই চোখ ধাতস্ত হয়ে যায়।

ওরা যখন মরগ্যান হাউসের কাছাকাছি পৌঁছল, তখন ঘড়িতে প্রায় পৌনে সাতটা। দিনের আলোয় যে বাড়িটাকে বেশ রোমান্টিক মনে হয়েছিল, সেটাকেই এখন ভূতপুরি লাগছে। বাড়িতে ঢোকার মুখে পা যেন আটকে আসে। কেমন একটা অজানা ভয় গ্রাস করতে শুরু করেছে। বাড়ির বাইরে কোনও লাইট জ্বলছে না কেন? কাচের দরজা, জানলা দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলোও কেমন যেন অনুজ্জ্বল ফ্যাকাশে। আশপাশে কোনও ঘরবাড়ি নেই। মিলিটারি ক্যান্টিনটাও বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে গেছে। মরগ্যান হাউসের গেটে কেয়ারটেকারের বসার জন্য একটা ছোট্ট ঘর আছে।

সেখানেই এক-একজন কেয়ারটেকার সিফট অনুযায়ী পাহারা দেয়। কুর্চি ও বিতান ঢোকার সময় দেখে গেট বন্ধ। দু'বার কড়া নাড়তেই সেই ছোট্ট ঘরটা থেকে একজন বৃদ্ধ বেঁটে-খাটো মানুষ হাতে একটা ছোট হ্যারিকেন নিয়ে কাশতে কাশতে বেরিয়ে আসে। বিতানরা কিছু বলার আগেই একটা চাবি নিয়ে গেট খুলতে খুলতে নিজের মনেই আস্তে আস্তে বলে, ''লোডশেডিং সাহাব। আ জায়েগা।'' কিন্তু একহাতে হ্যারিকেন নিয়ে অন্য অশক্ত হাতে তালা চট করে খুলতে পারে না।

বিতান ব্যস্ত হয়ে বলে, ''আরে কী করছ? একটা তালা খুলতে এতক্ষণ লাগে! এত বয়স্ক লোককে এরা কেন যে রাখে—!''

বিতানের গলা শুনে সেই বৃদ্ধের হাত থেকে চাবির থোকাটা পড়ে যায়। হাতের হ্যারিকেনটা কোনও রকমে কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে ধরে বিতানের মুখের কাছে। বিতান ও কুর্চি তখন দু'জনেই গেটের ওপারে। আর সেই বৃদ্ধ এপারে। সেই হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় বিতান দেখে বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক বৃদ্ধ। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। গালে বয়সের অজস্র বলিরেখা। বিতানের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এক ভাবে। কয়েক মুহূর্ত পর অবাক বিস্ময়ে বলে, ''বাবুজি আপ? ইতনে দিনোকে বাদ!''

ইতিমধ্যেই আরেকজন কেয়ারটেকার এসে সরিয়ে দেয় বৃদ্ধকে। সে নেপালি হলেও বেশ ভালো বাংলা বলে। পড়ে যাওয়া চাবি তুলে গেট খুলতে খুলতে বলে, ''স্যরি স্যার। আমি আসলে এই দাজুকে রেখে একটু টিফিন করতে গিয়েছিলাম।''

বিতান বা কুর্চি কেউই কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই। তবু কুর্চি জিজ্ঞাসা করে, ''লোডশেডিং চলছে? জেনারেটর নেই?''

— ''আছে ম্যাডাম। কিন্তু কয়েকদিন হল খারাপ হয়ে গেছে।''

ওরা আর কিছু না বলে ভেতরে চলে এলো। ডাইনিংয়ে ঢুকে কুর্চি আগেই জিজ্ঞাসা করল, ''আপনারা কেউ রাতে থাকবেন না?'' ওরা সবাই উত্তর দিল, ''না।'' বলল একজন কেয়ারটেকার শুধু থাকবে।

কুর্চি ও বিতানের সঙ্গে একজন বয় দুটো সুদৃশ্য ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড নিয়ে ওদের ঘরে গিয়ে রেখে দিয়ে এলো। সঙ্গে বেশ কয়েকটা ক্যান্ডেল ও লাইটার

রেখে দিল। যদি রাতে দরকার লাগে। কুর্চি জিজ্ঞাসা করল, ''আজ কারেন্ট আসবে না?'' বয় জানাল, ঝড়–বৃষ্টির জন্য কাছাকাছি কোথাও ফল্ট হয়েছে। আজ আসার সম্ভাবনা না থাকলেও আগামিকালের মধ্যে এসে যাবে। নীচ থেকে ওপরে আসার সময়েই ওরা চাইনিজ অর্ডার দিয়ে এসেছিল।

জামাকাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হতেই ওদের খাবার এসে যায়। বিতান বলে, ''ভালোই হল। তোমার কতদিনের সখ ছিল ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করার।'' কুর্চি গম্ভীর ভাবে শুধু একবার ''হুম'' বলে। বিতান এতক্ষণ ধরে এটাই ভয় করছিল। কুর্চির রাগকে সে ভীষণ ভয় পায়। কুর্চির কাছে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ''খাবে এসো। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।''

কাটা চামচে কিছুটা চাউমিন প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বিতান বলে, ''প্লিজ ট্রাস্ট মি কুর্চি। আমি জানি না আমার সঙ্গে কী হচ্ছে! কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি আগে কখনও এখানে আসিনি।''

কুর্চি বিতানের এমন অসহায় কণ্ঠস্বরে অনেকটা নরম হয়। বুঝতে পারে তার স্বামী যা বলছে, তার কোনওটাই মিথ্যে নয়। কিন্তু দু'জন মানুষ একইদিনে বিতানকে এমন কথা বলবে কেন? বিতানকে সে কথা বলতেই বিতান বলে, ''আমিও সেটা বুঝতে পারছি না কুর্চি। শুধু তুমি রেগে যাবে বলে কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু ট্রেনে চাপার পর থেকে আমার সঙ্গে যা কিছু হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না।''

বিতান তখন ট্রেনের সেই ঘটনা থেকে শুরু করে তার মনে সারাদিন ধরে যত তোলপাড় হয়েছে, সব একনাগাড়ে বলে যায় কুর্চিকে। শুনে কুর্চিও কম অবাক হয় না। খাওয়া শেষ করে কুর্চি বলে, ''অত চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন চলো ঘুমিয়ে পড়ি। এত ঠান্ডায় আমি আর বসে থাকতে পারছি না। সারাদিন একটুও রেস্ট নেওয়া হয়নি!''

তার পর চেয়ার থেকে উঠে পেছন থেকে বিতানের গলা জড়িয়ে ধরে দুষ্টুমি করে বলে, ''মাই ডার্লিং হাজব্যান্ড, একটা কথা শুধু ভাবো, পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত ইংরেজ বাংলোতে আমরা দু'জন। সারা বাড়িতে আর কেউ নেই। বাইরে বৃষ্টি। ভেতরে লোডশেডিং। অউর হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হো।

ব্যাপারটা বেশ আদর্শ রোম্যান্টিক ভৌতিক উপন্যাসের প্লট হিসেবে মন্দ নয়।''
বিতান একটু খেপানোর জন্য বলে, ''না, মন্দ নয়। তবে ইতিহাসের অধ্যাপিকার হাতে বাংলা উপন্যাস তো— জাস্ট জমে যাবে।''
কুর্চি ছদ্ম রাগ দেখিয়ে বলে, ''তোমার সঙ্গে কথাই বলব না। আমি চললাম শুতে। মিসেস মরগ্যান যখন আসবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে, আমাকে উঠিয়ে দিও।''
কুর্চি শুয়ে পড়ার পর বিতানও কুর্চির পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। তুলতুলে নরম দুধ সাদা বিছানা। শরীর ক্লান্ত থাকায় শুতে না শুতে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

১৩

রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। হঠাৎ একটা বাজ পড়ার শব্দে বিতানের ঘুম ভেঙে যায়। মোবাইলটা বালিশের পাশেই ছিল। বিতান ভাবল, বোধ হয় সকাল হয়ে গেছে। প্রবল উৎসাহে মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখে সবে বারোটা পঁয়ত্রিশ। তার মানে পুরো রাতটাই এখনও বাকি। মোমবাতিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গোটা ঘর মোমবাতির নেভা নেভা আলোয় পরিপূর্ণ। এমন সময় মোবাইলের আলো চোখে পড়ে ঘুম ভেঙে যায় কুর্চির। বিতানের দিকে ঘুম চোখে তাকিয়ে বলে, ''তুমি জেগে আছ, ঘুমোওনি?''
— ''না ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা বাজ পড়ার আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল।''
কুর্চি বিছানা থেকে অল্প একটু উঠে ঘুমন্ত কণ্ঠস্বরে বলল, ''আমাকে একটু জল দাও তো। গলাটা শুকিয়ে গেছে। রাত্রে নুডলস খেয়ে আমার বোধ হয় অ্যাসিডিটি হয়ে গেছে।''
বিতান বিছানা থেকে উঠে টেবিলে জল আনতে গিয়ে দেখে, বোতলে একটুও জল নেই। দু'বোতল মিনারেল ওয়াটার রুমেই রাখা ছিল। কিন্তু দুটোই যে খেতে খেতে কখন শেষ হয়ে গেছে, সেটা খেয়াল করেনি। রুমের বাইরে আর কোনও জলের অপশন নেই। জল আনতে গেলে সেই নীচে ক্যান্টিনে যেতে হবে। সেখানেই অ্যাকুয়াগার্ড লাগানো আছে। বিতান কুর্চিকে বলে, ''জল তো শেষ। এত রাতে জল পাই কোথায় বলতে পারো?''

কুর্চি ভালো করে বিছানার ওপর উঠে বসে বলে, ‘‘যাও, সুকুমার রায়কে জিজ্ঞাসা করো গে। তোমার বউ একটু শুধু জল খেতে চেয়েছে। আর তুমি সেটুকু দিতে পারছ না?’’

বিতান বলল, ‘‘দাঁড়াও। ল্যান্ড ফোন থেকে নীচে রিসেপশনে একটা ফোন করি। কেয়ারটেকার ঘুমিয়ে গেলেও ফোনের আওয়াজ নিশ্চয় শুনতে পাবে।’’

কিন্তু বারবার ফোন করা সত্ত্বেও কেউ রিসিভ করল না। রিং হওয়ার শব্দ ওপরের রুম থেকেই শোনা যাচ্ছিল। রিং হওয়ার আওয়াজ মাঝ রাত্তিরের ফাঁকা বাড়িতে কান্নার মতো শোনাল। যেন কেউ বহু বছর ধরে গুমরে গুমরে কাঁদছে।

বিতান হতাশ হয়ে বলে, ‘‘বেশ। আমি তবে নীচে চললাম জল আনতে। তুমি একা থাকতে পারবে তো?’’

— ‘‘হ্যাঁ, তুমি যাও তো। আমি বরং এই সুযোগে মিসেস মরগ্যানের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।’’

বিতান মৃদু হেসে বোতল আর এক হাতে মোবাইলটা নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু নীচে একা যেতে তার প্রবল আপত্তি। পা কিছুতেই চলছে না। কে যেন আটকে রেখে দিয়েছে। কেমন যেন গা ছমছম করছে। অথচ মুখ ফুটে সে কথা বলতেও পারছে না কুর্চিকে। ছেলে হয়ে ভূতে ভয় পাচ্ছে শুনলে কুর্চি সারাক্ষণ খেপাবে। সাহসে ভর করে দরজার কাছ পর্যন্ত গেল। হঠাৎ কী যেন মনে হওয়ায় কুর্চিকে বলল, ‘‘মোমবাতিটা তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নতুন একটা জ্বেলে দিয়ে যাব?’’

এ কথা শুনে কুর্চি রেগে যায়। একেই তার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেছে অ্যাসিডিটির জন্য। তার পর বিতান সামান্য জল আনতে গিয়ে এত টালবাহানা করছে দেখে বলে, ‘‘নাহ, আর মোমবাতি জ্বালার দরকার নেই। আমরা তো এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ব। চট করে গিয়ে একটু জল নিয়ে আসবে, তার জন্য কত কাণ্ডই না করছ!’’

বিতান কুর্চির ধমকানি খেয়ে কোনও উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিল। ঘরের বাইরে বেরোতেই তার মনে পড়ল, এখানে আসার আগে কুর্চি বলেছিল, এই বাড়িতে থাকতে গেলে ছ’মাস আগে থেকে

নাকি বুকিং করতে হয়। কিন্তু তারা যখন থেকে এসেছে, তখন থেকে আর কোনও টুরিস্টকে দেখতে পায়নি। অথচ বুকিং করার সময় এই একটা রুমই নাকি খালি ছিল। এ-সব ভাবতে ভাবতেই সে মোবাইলের আলোটা জ্বেলে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল।

মরগ্যান হাউসের ভেতরের পুরোটাই কাঠের ফ্লোর। কাজেই কেউ হাঁটলেই বেশ খটখট আওয়াজ হয়। কয়েক ধাপ নামার পরই মনে হল কেউ যেন তার পেছনে পেছনে নামছে। বিতানের গোটা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। রক্ত চলাচল এত জোরে হতে শুরু করল যেন এখনই তার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে বেরিয়ে যাবে। এই শীতের রাতেও সে ঘামতে শুরু করেছে। থমকে দাঁড়াল। মনে সাহস এনে হঠাৎ পেছনের দিকে তাকাল বিতান।

কিন্তু ফাঁকা করিডরে টবের ওপর কয়েকটা ইনডোর প্ল্যান্টের রাতঘুম ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। বিতানের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তার এই ভয় পাওয়াটা যে নিতান্তই মনের ভুল, সে কথা নিজেকে বুঝিয়ে নীচে নেমে গেল। লোডশেডিং হওয়ায় কোথাও আলো নেই। শুধু কাচের দরজা দিয়ে ঘরের বাইরেটা বিদ্যুতের আলোয় একঝলক করে দেখা যেতে লাগল।

বিতান মোবাইলের আলোয় এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল কেয়ারটেকারকে। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে তার শরীরে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। এমন অবস্থায় তাকে জীবনে কোনওদিন পড়তে হয়নি। কারেন্ট না থাকায় যে অ্যাকুয়াগার্ডও চলবে না সেটা তার আগেই ভাবা উচিত ছিল। তবু সে খুঁজে খুঁজে ডাইনিং হলে গিয়ে দেখে, দুটো কাচের জগে জল ভর্তি করে রাখা আছে। মোবাইলটা উল্টো করে টেবিলে রেখে সে কোনও রকমে বোতলে জল ভর্তি করে।

চারপাশটা একেবারে শুনশান হয়ে আছে। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। মনে হচ্ছে গোটা বাড়িটায় বিতানই একমাত্র জীবন্ত। এত বড় পৃথিবীটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কতক্ষণ সময় পেরিয়ে গেছে খেয়াল নেই। বিতান জল নিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। কুর্চির কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন? ও কি আবার ঘুমিয়ে পড়ল? ভাবতে ভাবতে রুমের কাছে চলে আসে বিতান। এতক্ষণে ভয়ের

হিমেল স্রোতটা যেন তার শরীর থেকে নেমে যায়। দরজার লকটা ধরে ঠেলে খুলতেই দেখে স্বপ্নে দেখা সেই মুখটার ছায়ামূর্তি। চিৎকার করে ওঠে বিতান। হাত থেকে তার ফোন আর জলের বোতলটা পড়ে যায়। কুর্চি তাড়াতাড়ি করে বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে আসে বিতানের কাছে, ''কী হয়েছে, কী হয়েছে বিতান? কী হয়েছে?''

বিতান কোনও কথা বলতে পারে না। কুর্চি মেঝেতে পড়ে থাকা মোবাইল ও জলের বোতল তুলে বিতানকে ধরে ধরে নিয়ে আসে ঘরের ভেতর। বিতানের দেরি হচ্ছে দেখে সে কিছুক্ষণ আগেই একটা মোমবাতি জ্বেলে নিয়েছিল। বিতানকে বিছানায় বসিয়ে এক গ্লাস জল দিয়ে বলে, ''জলটা খাও।'' বলেই সে বিতানের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। বিতান পুরো জলটা শেষ করে বলে, ''এখান থেকে চলো কুর্চি। আমার ভালো লাগছে না।''

কুর্চি বলে, ''সে না হয় যাব। কিন্তু তুমি কেন এমন চিৎকার করে উঠলে?''

বিতান তখন সব ঘটনা বলে কুর্চিকে। সব শুনে কুর্চির মনেও কিছুটা সন্দেহ জাগে। ভাবে, যে মুখটা বিতান প্রায় দিন স্বপ্নে দেখে, তাকে এত রাতে এখানে দেখবে কেন? ব্যাপারটা এমন সিরিয়াস পর্যায়ে চলে গেছে যে, এটাকে শুধু মনের ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কুর্চি মুখে সে কথা প্রকাশ করে না। বিতানকে আশ্বস্ত করে বলে, ''কোনও ভয় নেই। আমি আছি তো!''

বিতান পরম নির্ভরতায় শিশুর মতো জড়িয়ে ধরে কুর্চিকে। কুর্চি বিতানের চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে ভাবে অনেক কথা। এখানে এসে একটা অজানা অচেনা সমস্যা অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে ওদের। সেখান থেকে বেরোনোর কোনও রাস্তা কি আদৌ আছে?

১৪

সকালের আলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে যায় বিতানের। কুর্চি তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিতান বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। পর্দা সরিয়ে জানলা খুলে দিতেই দূরে পাহাড়ের দিকে চোখ যায়

বিতানের। বৃষ্টি থেমে গেছে। পাখিরা ঘুম থেকে উঠে কিচিরমিচির শুরু করেছে। কাল তৃণাঞ্জন ঠিকই বলেছিল, আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই সব খারাপ লাগার অবসান হয়ে যায়। আসলে আমরা ভূতকে যত না ভয় পাই, তার চেয়ে বেশি ভয় পাই অন্ধকারকে। এখানকার প্রকৃতিটা কী সুন্দর। বিতানের ইচ্ছে করে একছুটে বাইরে গিয়ে ভোরের আলোর সঙ্গে খেলা করতে। বিতানের মনে পড়ে রাতের কথা। এত ভয় সে কোনওদিন পায়নি। রাতে যা কিছু ঘটেছে, তা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? তা ছাড়া স্বপ্নে দেখা সেই মুখকে সে রুমের ভেতর দেখল কী ভাবে!

কুর্চিরও ঘুম ভেঙে গেছে। আড়মোড়া ভেঙে বলে, ''গুড মর্নিং বিতান।''

বিতান কুর্চির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, ''মর্নিং।''

কুর্চি বিছানা থেকে উঠে জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ''হেই বিতান, বৃষ্টি ছেড়ে গেছে। মর্নিং ওয়াকে যাবে?''

বিতান একপায়ে রেডি। ওরা তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়ল। নীচে নেমে দেখে দরজা খোলা। একজন নেপালি লোক সাফাই করছে। ওদের নেমে আসতে দেখে একজন বয় এগিয়ে এসে বলে, ''গুডমর্নিং স্যার, গুডমর্নিং ম্যাডাম। চা রেডি হয়ে গেছে। আপনারা কি এখনই ব্রেকফাস্ট করবেন?'' জিজ্ঞাসা করতে করতেই ওদের নিয়ে ডাইনিং হলে চলে আসে।

বিতান আগে পাহাড়ে না এলেও কুর্চি বেশ কয়েকবার এসেছে বাবা-মার সঙ্গে। পাহাড় কুর্চির প্রিয়। কিন্তু পাহাড়ের চা সে মোটেই পছন্দ করে না। না করার একটা কারণও আছে। পাহাড়ের লোকেরা চায়ে আদা থেকে শুরু করে তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি —সবই দেয়। পরিবেশন করার সময় পাহাড়ি লোকগুলোর মুখে ঝুলে থাকে এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তির হাসি, যেন মহৎ কোনও কাজ করেছে!

ওদের ধারণা, বাঙালিরা ভালো করে চা খেতে জানে না। তা সেই হার্বাল টি সর্দি-কাশির পক্ষে উপকারি হলেও জিভের পক্ষে সুস্বাদু মোটেই নয়। বিশেষত যারা কলকাতার ফুটপাথে মাটির ভাঁড়ে বিহারিদের হাতে তৈরি চা খেয়েছে, তাদের পক্ষে অন্য জায়গার চা মুখে লাগা মুশকিল। এক নম্বর দার্জিলিং টি-ও

সেই গুঁড়ো চায়ের কাছে হার মানবে। সেটা অবশ্য ব্যক্তি বিশেষে প্রযোজ্য। মরগ্যান হাউসের চা–টা অবশ্য ততটা খারাপ নয়। তা ছাড়া চিনেমাটির তৈরি সুন্দর কাপডিশে অতি জঘন্য চা–ও সুস্বাদু মনে হবে। প্রেজেন্টেশেনটাই বর্তমান যুগের মূল কথা। চা পর্ব সেরে ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো।

গতকাল বৃষ্টির জন্য বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখা হয়নি। বাড়ির বাইরের লনটা এত সুন্দর যে, শুধু সেটুকু ঘুরলেই সময় কেটে যাবে। চারিদিকে অসংখ্য ফুলের গাছ। কুর্চি মোবাইলে একের পর এক ছবি তুলে যায়। কখন যে আবার বৃষ্টি নামবে! বিতানের সঙ্গে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা সেলফি তুলে কুর্চি বাগানের এক কোণে চলে যায়। সেখানে কয়েকগুচ্ছ লাল রোডোডেনড্রন সবে ফুটতে শুরু করেছে। স্থানীয়রা এই ফুলকে বলে গুরাস। বিতানও ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পেছনে চলে যায়। সেখানেও অনেকটা ফাঁকা জায়গা। হাঁটতে হাঁটতে সে একেবারে মরগ্যান হাউসের শেষ সীমানায় চলে যায়। আর কয়েক পা এগোলেই নীচে খাদ। সেখানে হঠাৎ চোখে পড়ে গাছপালার ভেতর একটা পরিত্যক্ত বেদিতে বসানো পুরনো বুদ্ধ মূর্তি। কিছু টাটকা ফুল তথাগতর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। যেন সদ্য কেউ গাছ থেকে পেড়ে তাঁর পায়ে নিবেদন করেছে। সেদিকে তাকিয়ে বিতানের মনে হয়, এর আগেও এখানে এই মূর্তির সামনে সে এসেছে অনেকবার। তখন মূর্তিটা এত জীর্ণ ছিল না।

ভাবনার স্রোতে হারিয়ে যেতে থাকে বিতান। কুর্চির ডাকে চমকে ওঠে, ''কী— গো, তুমি এত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ? —চলো। উই আর অলরেডি লেট।'' বলেই বিতানের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় কুর্চি।

কিন্তু হঠাৎ কী মনে হওয়ায় পিছন ফিরে কুর্চি দেখে, সেই ঝোপ–জঙ্গলে ঘেরা মূর্তির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা নীচের দিকে নেমে গেছে, সেখানে একটা মেয়ে লাল ওড়না গায়ে উঠে আসছে। দূর থেকে মুখটা স্পষ্ট দেখা না গেলেও মেয়েটা যে বেশ সুন্দরী, বোঝা যায়। কুর্চিকে থেমে যেতে দেখে বিতান বলে, ''কী দেখছ ওদিকে?''

কুর্চি থতমত খেয়ে বলে, ''না, কিছু না। একটা মেয়েকে দেখলাম। খুব সুন্দর।'' বিতান অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ''মেয়ে? কই, আমি দেখছি না তো!''

কুর্চি আবার সেদিকে তাকিয়ে বলে, ''তাই তো। গেল কোথায়? এই তো দেখলাম! গায়ে একটা লাল ওড়না ছিল।''
বিতান বলল, ''হবে হয়তো স্থানীয় কেউ। এখন চলো।''
ওরা গেটের কাছে চলে আসতেই একজন কেয়ারটেকার গেট খুলে দিল। কুর্চির মনে সন্দেহ না জাগলেও কৌতুহলবশত জিজ্ঞাসা করে, ''আচ্ছা, বাড়ির পেছনে জঙ্গলে একটা মেয়েকে দেখলাম। সে কি এখানে থাকে?''
কেয়ারটেকার কুর্চির এই প্রশ্ন শুনে মুখের ভাবটা এমন করল যেন সে স্প্যানিশ ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করছে। আমতা আমতা করে বলে, ''লেডকি? উস তরফ? না–না, আপনারা নিশ্চয় কোনও টুরিস্টকে দেখেছেন। এখানে অন্য কোনও মেয়ে থাকে না। ওদিকে একমাত্র সুরেশ দাজু থাকে।''
বিতান বলে, ''এই সুরেশ দাজু কে?''
সেই কেয়ারটেকারটি বলল, ''দাজু এখানকার অনেক পুরনো কেয়ারটেকার স্যার।''
বিতান আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু কুর্চি মাঝপথে থামিয়ে বলে, ''এবার এ–সব করে সকালটাও নষ্ট করবে তো?''
বিতান একটু লজ্জিত হয়ে বলে, ''সরি কুর্চি। চলো।''
রাস্তায় তখন মিলিটারি ও তাদের ফ্যামিলির ঢল নেমেছে। কেউ ওয়াকিং, তো কেউ জগিং। এত সকালেও সেই গলফ কোর্সে কয়েকজন মিলিটারি গলফ খেলছে। ওরা বেশ কিছুটা এগিয়ে যায়।

কুর্চির মনে পড়ল, কাল সন্ধে বেলায় হাঁটতে হাঁটতে বিতান হঠাৎ বলেছিল, এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট ও মনেস্ট্রি আছে। গুগল মহাশয়ও সে কথাই বলছে। বিতানের এই আগাম বলে দেওয়ার ব্যাপারটা কুর্চি কিছুতেই ধরি–ধরি করেও ধরতে পারছে না। ভিউ পয়েন্টটা অনেকটা দূরে হওয়ায় ওরা মনেস্ট্রি যাবে বলেই ঠিক করল। এখানে যে কোনও জায়গায় যেতে হলে হেঁটেই যেতে হবে। অন্য কোনও যানবাহনের ব্যাবস্থা নেই। কিছু দূর হাঁটার পরেই একটা চৌমাথা পেল। সেখানে প্রচুর সশস্ত্র মিলিটারি পাহারা। পুরো এরিয়াটাই রেস্ট্রিকটেড। একটা মাত্র রাস্তা সর্বসাধারণের জন্য খোলা। ওরা সেই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেল।

সামনে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। সকালে স্কুল তখন সবে শুরু হবে। কচিকাঁচাদের কলরব ওই পাহাড়ি নিঃস্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করে দিতে থাকে। অনেকটা রাস্তা চলার পর ডুরপিন মনেস্ট্রিতে এসে পৌঁছল ওরা। সেখানে তখন সকালের স্তোত্রপাঠ শুরু হয়েছে। বেশ একটানা সুর। কিছু বোঝা না গেলেও শুনতে ভালো লাগে। এতটা রাস্তা হেঁটে এসে কুর্চি বেশ হাঁপিয়ে গেছে। বিতানও একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়ে। চারদিকে লাল ড্রেস পরা বিভিন্ন বয়সের লামারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে বাচ্চাগুলোকে দেখতে বেশ লাগে। কত কম বয়সে নিজের মা-বাবাকে ছেড়ে এরা লামা হয়ে যায়। বিতানের এদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনেক দিনের। কিন্তু কলকাতায় কাজের চাপে কিছুই জানা হয় না। সেই স্তোত্রপাঠ শুনতে শুনতে বিতান ভাবে, কত মানুষের কত রকম বিচিত্র জীবন। অথচ আমরা নিজেদের নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি। এই পৃথিবীটা সত্যি বড় রহস্যময়। অজানা, অচেনা। এই অজানাকে জানার যাত্রাপথ মানুষের কোনও দিন ফুরোবে না।

কুর্চি বিতানের কাছে এসে বলে, ''এই আমার একটা ছবি তুলে দাও না।''
বিতান জিভ কেটে বলে, ''সে কী! ঢোকার সময় বোর্ডের লেখাটা চোখে পড়েনি ফোটোগ্রাফি প্রোহিবিটেড!''
— ''আচ্ছা ঠিক আছে, যেখানে প্রোহিবিটেড নয়, সেখানে তো তুলতে পারব?''
বাইরে গিয়ে একটা ঘণ্টার সামনে কুর্চি পোজ দেয়। কুর্চিকে আজ ভারি সুন্দর দেখায়। একটা ডেনিম জিন্স আর সাদা কুর্তির ওপর ব্ল্যাক কালারের একটা জ্যাকেট। ফোটো তোলার জন্যই বোধ হয় চুলগুলোও খুলে রেখেছে। বিতান বেশ কয়েকটা ছবি তোলার পর বলে, ''ভুলেও এ-সব ছবি আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট কোরো না। তা হলে আমার একমাত্র বউটি হাতছাড়া হয়ে যাবে!''
কুর্চি বলল, ''বাহ্! ভালো মনে করিয়েছ তো! কাল থেকে একের পর এক ঝামেলায় একটা ছবিও পোস্ট করা হয়নি। অথচ আমার কলিগরা আসার সময় বারবার বলে দিয়েছিল, মরগ্যান হাউসে পৌঁছেই আমি যেন বাড়িটার একটা

ছবি পোস্ট করি। সকলেই খুব ইন্টারেস্টেড।'' বলেই মনেস্ট্রি-সহ মরগ্যান হাউসের কয়েকটা ছবি ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে আপলোড করে দেয়।

১৫

বিতানরা কেউই ব্রেকফাস্ট করে বেরোয়নি। এতটা হাঁটাহাঁটি করে দু'জনেরই মারাত্মক খিদে পেয়ে গেছে। মনেস্ট্রি থেকে মরগ্যান হাউস অনেকটাই দূরে। বিতান বলে, ''চলো, সামনের দোকানটাতে নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে। ওখানেই কিছু খেয়ে নিই।''

মনেস্ট্রি লাগোয়া ছোট্ট একটা টিনের ছাউনি দেওয়া দোকান। সমস্ত পাহাড়ি অঞ্চলে দোকানপাট দেখাশোনা করে মূলত মেয়েরাই। এক নেপালি মহিলা বসে রেডিও শুনছিল। বিতান তাকে বলে, ''নমস্তে দিদি, খানেকে লিয়ে কুছ মিলেগা?''

সেই মহিলা গরম ভেজ মোমো আর চা বানিয়ে নিয়ে আসে। দোকানে খাওয়ার সময় একটা আননোন নাম্বার থেকে ফোন আসে কুর্চির কাছে। কুর্চি ''হ্যালো'' বলতেই ওপার থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, ''তুই কি মরগ্যান হাউসে এসেছিস? হোয়াটসঅ্যাপে দেখলাম। তোরা যে আসছিস, একবার জানাবি তো? কোনও যোগাযোগই রাখিস না। কলেজে পড়াস বলে কি তুই আমাকেও ভুলে যাবি?''

এতগুলো প্রশ্ন করার পর ওপারের কণ্ঠস্বর একটু শান্ত হয়েছে দেখে কুর্চি বলে, ''ওহ মুনিদি! তুই অন্য নাম্বার থেকে কল করলে কী করে বুঝব বল তো?''

— ''আরে, এটা আমার জিওর নাম্বার। আচ্ছা শোন, বাকি কথা পরে হবে। এখন বল তো তোরা ঠিক কোন জায়গায় আছিস?''

— ''আমরা—'' চারদিকে তাকিয়ে, ''এখন ডুরপিন মনেস্ট্রির কাছে একটা দোকানে বসে মোমো খাচ্ছি।''

— ''দেখেছ কাণ্ড! আমার বাড়ির কাছে এসে ওনারা দোকানে মোমো খাচ্ছেন! তুই ওখানেই দাঁড়া। আমি গাড়ি পাঠাচ্ছে এক্ষুণি। চলে আয় তাড়াতাড়ি।''

— ''আরে শোন—'' বলতেই ফোনটা কেটে গেল। বিতানের দিকে তাকিয়ে

কুর্চি বলে, ''মুনিদি ফোন করেছিল।'' বিতান একটু মনে করার চেষ্টা করে বলল, ''মুনিদি মানে তোমার মামাতো দিদি? ওনার হাজব্যান্ড তো কর্নেল তাই না? আমার সঙ্গে একবারই পরিচয় হয়েছিল তোমাদের বাড়িতে। মহিলা বড্ড টকেটিভ।''

কুর্চি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে, ''যা বলেছ। বদ্ধ পাগল! আমাকে কোনও কথা বলতেই দিল না। নিজেই শুধু বকবক করে গেল। বলল এখানে গাড়ি পাঠাচ্ছে। লাস্ট যখন কথা হয়েছিল, তখন শুনেছিলাম, জামাইবাবু কাসৌলিতে পোস্টিং। তার পর থেকে আর যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। এরই মধ্যে যে এখানে পোস্টিং হয়ে চলে আসবে, কী করে জানব? আমারও ফোন করা হয়নি। আর মুনিদিও করেনি।''

ওরা কথা বলতে বলতেই কর্নেল মিশ্রর পার্সোনাল গাড়ি এসে হাজির। মোমোর দোকানে বিল মিটিয়ে ওরা গাড়িতে উঠে পড়ে। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর গাড়িটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বেশ বড় কোয়াটার কাম বাংলোর কাছে এসে দাঁড়ায় গাড়িটা।

১৬

বাইরে থেকে ভেতরের প্রশস্ত বাগান দেখা যায়। শীতকালীন নানা রঙের পাহাড়ি ফুল আলো করে রেখেছে বাগানটাকে। ওরা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মৌপ্রিয়া ওরফে মুনিদি বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল কুর্চিকে।

— ''কতদিন পর তোকে দেখছি কুর্চি! কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার!'' তার পর বিতানের দিকে তাকিয়ে ''এসো এসো, চলো ভেতরে চলো। কেমন আছ বলো? বাড়ির সবাই ভালো তো?'' বলতে বলতেই ওদের ভেতরে নিয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো। সর্বত্রই রুচির ছাপ স্পষ্ট। দেওয়ালের এক কোণে বড় করে কর্নেল শুভঙ্কর মিশ্র ও তার স্ত্রী মৌপ্রিয়ার বিয়ের ছবি। পাশেই ফুটবলের ওপর পা রেখে ফুটফুটে দুই ছেলের ছবি হট্ট

ও গোল। দু'জনেই সিমলায় পড়শোনা করে। বেশ কিছু মেডেল সযত্নে সজানো রয়েছে শোকেশে। কুর্চি চারদিক ভালো করে দেখে বলে, ''বাহ মুনিদি! দারুণ সাজিয়েছিস তো ঘরখানা!''

ততক্ষণে একজন সুসজ্জিত আর্মি কালচারে অভ্যস্ত পরিচারক এসে কফি ও নানা ধরনের স্ন্যাক্স সাজিয়ে দিয়ে গেল। মৌপ্রিয়া হেসে বলে, ''সারাদিন আর আমার কাজ কী বল? ওই টুকটাক ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন করি আর কী! ও-সব তুই পরে দেখবি'খন। এখন কফিটা খা তো, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে! আর ব্রেকফাস্টে কী খাবি বল?''

কুর্চি চোখ কপালে তুলে সোফায় বসে পড়ে বলে, ''আবার ব্রেকফাস্ট? কিছুক্ষণ আগেই আমরা অনেকগুলো মোমো সাঁটিয়েছি। আর কিচ্ছু খেতে পারব না।''

বিতানের দিকে কটমট করে তাকিয়ে মৌপ্রিয়া বলল, ''ও না খাক, তুমি অন্তত কিছু— নাকি তুমিও আবার তোমার বউয়ের মতো ন্যাকামো করবে?''

বিতানকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কুর্চি হাসতে হাসতে বলল, ''তুই এখনও অমনি ঠোঁট কাটা রয়ে গেছিস! জামাইবাবু তোকে কিছু বলে না?''

— ''ওর আর বলার সময় কোথায়? সারাদিনই তো ব্যস্ত! যে-টুকু সময় পায়, গলফ খেলে। তা ছাড়া নিত্যদিন পার্টি তো লেগেই আছে। আমার কাজ শুধু সেজেগুজে যাওয়া আর হে হে করা। একটা বাঙালি লোকও নেই, যার সঙ্গে দু'দণ্ড বাংলায় গল্প করা যায়!''

— ''লাস্ট তোর সঙ্গে যখন কথা হয়, তখন তোরা কাসৌলিতে ছিলিস না?''

— ''হ্যাঁ রে, আর বলিস না। কয়েক বছর ছাড়া ছাড়াই তোর জামাইবাবুর ট্রান্সফার। এই কাশ্মীর তো এই হিমাচল। এই পুনে তো এই চণ্ডীগড়। জীবনটা পুরো সাটেল কক হয়ে গেল! এ নিয়ে কত জায়গায় যে সংসার পাতলাম আর গুটোলাম!''

কুর্চি মিষ্টি হেসে বলে, ''আগের থেকে অনেক স্লিম হয়েছিস কিন্তু। লুকিং গুড।''

— ''আরে, কর্নেলের বউ হওয়া মুখের কথা নয়! এটিকেট মেইনটেন করতে করতে পাগল হয়ে গেলাম। রোজ ভোর বেলায় তোর জামাইবাবুর সঙ্গে

জগিংয়ে যেতে হয়। ফিরে এসে তেতো গ্রিন টি। আলু চিনি ভাত সব বন্ধ।''
কুর্চির কাছে মুখ এনে ফিসফিস সুরে বলে, ''মোটা চেহারা নিয়ে পার্টিতে যেতে ভীষণ লজ্জা লাগে জানিস তো! আজ তোরা এসেছিস বলে উনি বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছেন! না হলে রোজ ওই ব্রকোলি সেদ্ধ, দই, শসা, চিকেন স্ট্যু। জীবনটা অরুচি হয়ে গেল!''
কুর্চি হাসতে হাসতে বলল, ''তা তোর হট্ট আর গোলের কী খবর?''
— ''ওরা ঠিকই আছে। বিচ্ছু দুটো আচ্ছা জব্দ হয়েছে বোর্ডিংয়ে গিয়ে। তবে পড়াশোনাটা মোটামুটি করছে এই যা। ছুটিছাটা পড়লে নিয়ে আসি।'' তার পর ফিসফিস করে কুর্চিকে বলে, ''হ্যাঁ রে, তোরা কবে বেবি নিবি? দু'জনেই ওয়েল সেটেলড। বয়সও তো বেশ বাড়ছে।''
কুর্চি মাথা নীচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিয়ে বলল, ''ছাড় না মুনি দি, আমরা আর জনসংখ্যা বাড়াতে চাই না রে! এই বেশ ভালো আছি।''
বিতান এতক্ষণ চুপ করে দুই বোনের কথা শুনছিল। মহিলার মধ্যে কর্নেলের বউ হওয়ার অহঙ্কার স্পষ্ট। তবে যারা বেশি কথা বলে তারা মনের দিক থেকে অনেক বেশি পরিষ্কার। এ রকম পার্বত্য পরিবেশে একা থাকতে থাকতে মুনিদি হাঁপিয়ে উঠেছেন। কুর্চিকে কাছে পেয়ে সত্যি খুশি হয়েছেন। অধিকাংশ বরের মতো এঁর বরও এঁকে হয়তো সময় দেন না। এটা অবশ্য সব বউদের কমন অ্যালিগেশন। বর ঠিকঠাক সময় না দেওয়ায় কত দাম্পত্য যে ভেঙে গেছে! বই, টিভি, গান, সিনেমা— এ-সব বিনোদন মানুষের যতই থাক দিনের শেষে একটা কথা বলার মানুষ প্রয়োজন। একটা বন্ধু প্রয়োজন। শুধু এ-সব নিয়েই যদি মানুষ ভালো থাকতে পারত, তা হলে তার বন্ধুর প্রয়োজন হত না। বিয়ে করারও দরকার পড়ত না। সারা দিনের কর্মক্লান্তির শেষে একটা জীবন আরেকটা জীবনের কাছে ফিরে আসতে চায়। অথচ সেখানেও কত বৈরিতা!

আচ্ছা সে নিজেও কি কুর্চিকে সময় দেয়? এ নিয়ে বিয়ের পর তো কম অশান্তি হয়নি! একটা সময়ের পর কুর্চিও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন সে সারাক্ষণ নিজেকে নিজের মতো করে ব্যস্ত রাখে। ভালো থাকার জন্য আর বিতানের

মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। বিতান এটাই চেয়েছিল। তবে নিজেকে এখন মাঝে মাঝে এত নিঃসঙ্গ লাগে কেন! দুই বোনের উচ্চস্বরের হাসিতে সংবিৎ ফেরে বিতানের। মৌপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বিতান বলে, ''শুভঙ্করদাকে দেখছি না?''

মুনিদি হেসে বলল, ''তাকে এখন কোথায় পাবে? লাঞ্চের সময় দেখা হবে। তোমরা আসছ শুনে আজকের মেনু তিনিই ঠিক করে দিয়ে গেছেন। আমার কুক কিন্তু দারুণ বিরিয়ানি বানায়!''

কুর্চি বাধা দিয়ে বলল, ''আরে, আমরা তো মরগ্যান হাউসেই লাঞ্চ—।''

মাঝপথে থামিয়ে দিল মৌপ্রিয়া, ''খুব পেকেছিস বল কলেজে পড়িয়ে? আমি থাকতে তোরা ওই ভূতের বাড়িতে লাঞ্চ করবি?''

কথাটা শুনে কুর্চি ও বিতান দু'জনেই থমকে যায়। ওদের সেই ভাবান্তর নজর এড়ায় না মৌপ্রিয়ার। অবাক হয়ে বলল, ''কী ব্যাপার? ভূতের বাড়ির কথা শুনে দু'জনেই কেমন চুপচাপ হয়ে গেলি? মিসেস মরগ্যানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হল নাকি?''

বিতান কিছু না বললেও কুর্চি ব্যাপারটা চেপে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, ''ভূতের বাড়ি?'' একটু তাচ্ছিল্যের সুরে হেসে বলে, ''মরগ্যান হাউসে ভূত আছে নাকি?''

মুনিদি ঠোঁট উল্টে বলে, ''আমি ঠিক জানি না, তবে শুনেছি। অনেক টুরিস্ট নাকি মাঝরাতে অশরিরী কাউকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে ওই বাড়িতে। আমরা তো কখনও থাকিনি। তাই সত্যি-মিথ্যে বলতে পারব না। কিছুদিন আগেই একটা ঘটনা ঘটেছিল। এক মাড়োয়ারি তার বউ-বাচ্চা নিয়ে থাকবে বলে এসেছিল। মাঝরাতে সবাই এমন ভয় পায় যে, লোকজন ডেকে সেই রাতেই অন্য কোন হোটেলে গিয়ে উঠেছিল! পরের দিন সকালেই তারা কলকাতা ফিরে যায়। আমরা সেদিন ওইদিকে জগিংয়ে গিয়েছিলাম। তখন দেখি একদল লোক ওই হাউসের সামনে জটলা করে কী-সব বলছে! পরে আমাদের ড্রাইভারের কাছ থেকে সব শুনলাম।''

বিতান ও কুর্চিকে খুব মন দিয়ে শুনতে দেখে মৌপ্রিয়া বলল, ''কী রে, তোরা আবার সব বিশ্বাস করে বসলি নাকি? সবাই শুধু বলে, ভূত আছে শুনেছি।

নিজের চোখে দেখেছি, এমন কথা কোনও লোককে বলতে শুনেছিস কোনও দিন? তা ছাড়া সব পাহাড়েই একটু-আধটু ভূত থাকে! পাহাড় হচ্ছে ভূতেদের থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। ও-সব নিয়ে ভয় পাস না।''

কুর্চি ও বিতান অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছে। কিছুতেই সত্যিটা বলতে পারছে না। এমন সময় বাইরে গাড়ির শব্দ। কর্নেল মিশ্র আজ কুর্চিদের অনারে একটু আগে-ভাগেই চলে এসেছেন। খুব মিশুকে মানুষ এই শুভঙ্কর। বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মধ্যে। কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। ওয়েল মেইনটেইনড এবং হ্যান্ডসাম। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সৎ ও পরোপকারী। নিরহঙ্কার। চেহারার মধ্যে বেশ একটা প্লিসেন্ট পার্সোনালিটি আছে। এই মানুষটিকে এর আগে একবারই দেখেছে বিতান। প্রথম থেকেই এই প্রাণবন্ত মানুষটিকে বেশ ভালো লেগেছিল বিতানের। কিন্তু মেলামেশার সুযোগ তেমন ভাবে হয়নি। পৃথিবীতে এমন বটগাছের মতো মানুষ খুব কমই আছে, যাদের সান্নিধ্য মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয়। কর্নেল শুভঙ্কর মিশ্র সেই বিরল গোত্রের মানুষের মধ্যে একজন। তিনি আসতেই গোটা বাড়িটা এক মুহূর্তে খুশির মহল হয়ে উঠল। গল্প হচ্ছিল কর্নেল মিশ্রর বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিংয়ের সুবাদে তাঁর বাংলা ভাষাটা হয়ে উঠেছে একেবারে ননবেঙ্গলিদের মতো। হিন্দির টান মেশানো। গল্পের ফাঁকেই পরিচারক এসে ড্রিঙ্ক সার্ভ করল। কুর্চি খেল না দেখে মৌপ্রিয়া ওর জন্য একটা সফট ড্রিঙ্কস নিয়ে এলো। কর্নেল মিশ্র একটা পেগ হাতে তুলে নিয়ে বললেন, ''আমি আসার আগে কী নিয়ে গল্প হচ্ছিল তোমাদের?''

বিতান বা কুর্চি কিছু বলার আগেই মৌপ্রিয়া বলে উঠল, ''ভূত নিয়ে। ওরা ভূত বাংলোয় উঠেছে কিনা!''

কর্নেল বললেন, ''এখানে এত বড় বাড়ি থাকতে তোমরা ওই হন্টেড হাউসে থাকবে কেন? আজই সব ব্যাগ নিয়ে চলে এসো। এখানেই থাকো।''

কুর্চি বিস্ময় নিয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, ''হন্টেড হাউস? আপনি বিশ্বাস করেন এ-সব জামাইবাবু?''

খুব ক্যাজুয়েল ভঙ্গিতে কর্নেল বললেন, ''আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না কুর্চি। তবে বাড়িটার হিস্ট্রি সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি, এটা তৈরি

হয়েছিল ১৯৩০ সালে। জর্জ মরগ্যান ছিলেন একজন জুট ব্যাবসায়ী। মিস্টার ও মিসেস মরগ্যানের বিয়ে উপলক্ষে বাড়িটি তৈরি হয়। কিন্তু তাদের ম্যারেড লাইফ বেশিদিন স্টে করেনি। কেউ বলে, মিস্টার মরগ্যান নাকি তাঁর বউকে একলা রেখে চলে গিয়েছিলেন। আবার কেউ বলে, মিসেস মরগ্যানকে তাঁর হাজব্যান্ড অত্যাচার করে মেরে ফেলেছিল। তার পর থেকেই ওই বাড়িতে নাকি একজন মেমকে প্রায় দেখা যায়।''

কুর্চি ও বিতান দু'জনের কপালেই বেশ চিন্তার ভাঁজ। গত দু'দিন ধরে তাদের সঙ্গে যা কিছু ঘটছে, তার সঙ্গে এই ভৌতিক কাহিনির মিল কোথায়? কর্নেল মিশ্র বিতানের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''এনি প্রবলেম উইথ ইউ? খুব ডিপলি কিছু চিন্তা করছ মনে হচ্ছে?''

বিতান ও কুর্চি তখন একে একে সব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বলে যায়। মৌপ্রিয়া ও কর্নেল মিশ্র মন দিয়ে তাদের কথা শোনে। মৌপ্রিয়া বলে, ''শুনে তো আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে! বেড়াতে এসে তোদের কী বিপত্তি বল তো!'' তার পর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, ''হ্যাঁ গো, আমি একা একা থাকব কী করে? তুমি কত রাত করে ফেরো!'' কর্নেল কিছুটা ধমকের সুরে মৌপ্রিয়াকে বললেন, ''ডোন্ট বি সিলি মৌ।''

তার পর কুর্চির দিকে তাকিয়ে বলেন, ''তুমি একটু আগে আমায় জিজ্ঞাসা করছিলে আমি ভূতে বিশ্বাস করি কিনা? তোমাদের সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে, সেটাকে অ্যানালিসিস তুমি কীভাবে করবে? আসলে কী জানো এই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই ঘটে, যার কোনও লজিক নেই। আমাদের সাধারণ বোধ-বুদ্ধিতে তার কোনও ব্যাখ্যা হয় না।'' বিতানের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''তবে বিতান আমার মনে হয়, কেয়ারটেকারের ব্যাপারটাকে সিরিয়াস নেওয়ার কোনও কারণ নেই। সে হয়তো তোমার মতো দেখতে কাউকে দেখেছে এর আগে। বয়স্ক মানুষ। অত মনে থাকার কথা নয়। তবে আমার ইনট্যিউশন বলছে, তোমার সঙ্গে এই মরগ্যান হাউসের কোনও একটা লিঙ্ক আছে। কেয়ারটেকারকে যদি বাদও দিই, তা হলে ওই মোমো দোকানের মাসি কী যেন নাম বললে ফুলি মাসি, সেও তোমাকে দেখে একই কথা বলবে কেন? সারাদিন কত কাস্টমার আসে দোকানে, কত টুরিস্ট আসে হোটেলে! বিশেষ কোনও

ব্যাপার না ঘটলে তাদের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। মিসেস মরগ্যানের ভূত-টুত এখানে ফ্যাক্টর নয়। অন্য কিছু একটা ব্যাপার আছে। দেয়ার ইজ সামথিং মিসটেরিয়স, যা আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। সেই লিঙ্কটা কিন্তু তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। আর এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবে কুর্চি।''
বিতান নড়েচড়ে বসে। খুব উদগ্রীব হয়ে বলে, ''কিন্তু কীভাবে এই রহস্যের সমাধান করব? কার কাছে যাব, কাকে জিজ্ঞাসা করব?''

কর্নেল মিশ্র বলেন, ''আমার মনে হয় একটু চেষ্টা করলেই উত্তরটা পেয়ে যাবে। এখন চলো। লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে।''
সকালের আনন্দ মুখর পরিবেশটা দুপুরের মধ্যেই কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল। কুক দারুণ খাবার বানিয়েছিল। বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ, সঙ্গে রায়তা, স্যালাড। বিতান খেতে খেতে বলল, ''এত ভালো বিরিয়ানি আমি কলকাতাতেও খাইনি!''
খাবার টেবিলে বসে গল্প করতে করতেই বিকেল হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের জন্য হলেও মনে যে ভয়ঙ্কর চাপটা তৈরি হয়েছিল, এই পরিবারের সান্নিধ্যে এসে তা অনেকটাই কেটে গিয়েছিল কুর্চি আর বিতানের। ফিরে আসার সময় ওদের বাড়িতেই থেকে যাওয়ার জন্য খুব জোরাজুরি করেছিল মৌপ্রিয়া। কিন্তু বিতানের তখন এক অদ্ভুত নেশা পেয়ে বসেছে। যতক্ষণ না সব প্রশ্নের উত্তর মেলাতে পারছে, ততক্ষণ তার শান্তি নেই। তাকে জানতেই হবে মরগ্যান হাউসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক! কেন সে এই বাড়িটাকে বারবার স্বপ্নে দেখেছে? তা ছাড়া ওই মেয়েটাই বা কে? বিকেল নাগাদ মৌপ্রিয়া গাড়িতে ওদের মরগ্যান হাউসে পৌঁছে দিয়ে গেল।

১৭

সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কারই ছিল। গেটে ঢোকার সময় কুর্চির হাতটা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বিতান বলল, ''আমাদের হাতে সময় খুব কম। এই অশান্তি আর ভালো লাগছে না। খুব

তাড়াতাড়ি আমাদের এই রহস্যের সমাধান করতে হবে।''

কুর্চিও এ ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। লড়াইটা বিতানের একার নয়, সে-ও জড়িয়ে গেছে এই লড়াইয়ে। সে বিতানকে আশ্বস্ত করে বলে, ''চলো দেখি, সেই গতকালের ওই বয়স্ক লোকটাকে পাই কিনা। তিনি আমাদের একমাত্র আশা।''

গেটের ভেতরে ঢুকে সেই বৃদ্ধের ব্যাপারে কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসা করতেই সে জানাল, সে এখানে নতুন জয়েন করেছে। কাজেই বলতে পারবে না। তবে এ কথা বলতে পারল, মরগ্যান হাউসের ডান দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের এক একটা কটেজ। কটেজের শেষ প্রান্তে আরও একটা ইংরেজ আমলের ঘর আছে, যেটা তখনকার দিনে বাড়ির পরিচারকদের থাকার জন্য ব্যবহার হত। সেখানেই এখন কেয়ারটেকাররা থাকে। কাজেই ওখানে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।

কুর্চি ও বিতান সেদিকেই তাড়াতাড়ি গেল। মূল মরগ্যান হাউস থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই ঘরগুলো। দু'পাশে ঘন গাছপালা। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু রাস্তা। কুর্চি মনে মনে ভাবছিল, রাত তো দূরের কথা, এই রাস্তায় দিনের বেলায়ও ভূত দেখা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সেখানে পৌঁছতেই দেখা গেল দু-একটা লোক সিগারেট খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছে। তাদের কাছে গিয়ে সুরেশ দাজুর নাম করতেই তারা একে অপরের দিকে তাকাল। কারণ, এত বছরে কেউ কোনওদিন তার খোঁজ করেনি। আজ হঠাৎ দু'জন শহুরে মানুষ এসে একজন ফুরিয়ে যাওয়া নেপালি বৃদ্ধের খবর নিচ্ছে দেখে তারা অবাকই হল। তারা জানাল, ওই জঙ্গলের পেছন দিকে তার একটা ভাঙা মতো বাড়ি আছে। সেখানে সে একাই থাকে। নিজের লোক বলতে তেমন কেউ নেই। মাঝে মাঝে পয়সাপাতি ও খাবারের জন্য তাদের কাছে আসে। মরগ্যান হাউসের অনেক পুরনো কেয়ারটেকার বলে সকলেই তাকে মায়া করে। যার যেমন সামর্থ্য, সে তেমন পাঁচ-দশ টাকা করে দেয়। অর্ধেক দিন না খেয়েই থাকে। সারাদিন ওই জঙ্গলেই পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়। নিজের মনেই বকবক করে। মাঝেমাঝে বাগানের টুকটাক আগাছা পরিষ্কার করে দেয় দুটো টাকার জন্য।

সুরেশ দাজুর কথা শুনে মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায় বিতানের। মানুষের শেষ বয়সটা বড় কষ্টের। সংসারে যখন আর তার দেওয়ার মতো কিছুই থাকে না, তখন সে সকলের অবহেলার পাত্র হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত পর বিতান জিজ্ঞাসা করে, ''আচ্ছা, তিনি কি এখন তাঁর বাড়িতেই আছেন? আমরা একবার যেতে চাই তাঁর কাছে।' একজন কেয়ারটেকার বলল, ''জানি না। আপনারা খুঁজে নিন।''

বিতান আর কুর্চি বুঝল, এদের কাছ থেকে আর তেমন সাহায্য পাওয়া যাবে না। বিকেলের আলো তখন পড়ে এসেছে। ওরা তাড়াতাড়ি মরগ্যান হাউসের পেছনের সেই রাস্তাটার কাছে এগিয়ে গেল। একটা ছোট্ট সরু ক্ষীণ হয়ে যাওয়া রাস্তার রেখা নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। রাস্তাটা ছোটখাটো গাছের ডালপালাতে ভর্তি। কুর্চির মনে পড়ল, আজ সকালে এই জায়গাতেই সে লাল ওড়না গায়ে দেওয়া মেয়েটিকে দেখেছিল। কুর্চি সেই ভাবনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বিতানের হাত ধরে আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগল। বিতান বলল, ''খুব সাবধানে নামতে হবে আমাদের। ভীষণ স্লিপারি রাস্তা। একটু অসতর্ক হলেই ব্যস!''

খুব বেশি দূর যেতে হল না। ঢালু রাস্তা ধরে কিছুটা নামার পর একটা সমতল জায়গায় দেখা গেল বহু পুরনো একটা কাঠের ঘর। ঘরের এক দিকটা ভেঙে পড়েছে প্রায়। তার চারপাশে বেশ গভীর জঙ্গল। মরগ্যান হাউস থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে যে এমন জঙ্গল ঘেরা রহস্যময় একটা জগৎ আছে, তা অধিকাংশ লোক জানতেই পারে না। মনে হচ্ছে এক লহমায় তারা সভ্য জগৎ থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে চলে এসেছে। এমন জায়গায় মানুষ থাকে কেমন করে!

কুর্চি ও বিতান চারপাশটা ভালো করে দেখে সেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। বিতান বাইরে থেকেই ডাকল। কিন্তু কোথাও কোনও সাড়া শব্দ নেই। দু-একটা পাখি শিস দিতে দিতে বাসায় ফিরছে। এদিকে সন্ধেও প্রায় ঘনিয়ে এলেও দিনের আলোর রেশ তখনও একটু রয়ে গেছে। কাউকে না দেখতে পেয়ে ওরা গুটিগুটি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই কাশির শব্দ শুনতে পেল। তবে শব্দটা ঘরের ভেতর থেকে নয়, বাইরে থেকেই আসছিল। বিতান সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে দেখল জঙ্গলের ভেতর থেকে সেই অশীতিপর বৃদ্ধ

লোকটা হাতে গোটাকতক গাছের ডালপালা নিয়ে এগিয়ে আসছে। বিতান তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে হাত থেকে ডালপালাগুলো নিয়ে রেখে দেয় সেই ঘরের সামনে। তার পর বৃদ্ধকে হাতে ধরে নিয়ে আসে। বিতান বা কুর্চি কিছু বলার আগেই সুরেশ ওদের দিকে তাকিয়ে জড়ানো গলায় হিন্দিতে বলে, ''কেন এসেছ বাবুজি আমার কাছে? আমার কাছে তো কেউ আসে না।''

বলেই ঘরের ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে।

বিতান বুঝতে পারে এটা তার অভিমানের কথা। বিতান ও কুর্চি সুরেশের সঙ্গে ভেতরে ঢোকে। ভেতরে আসবাব বলতে কিছুই নেই। একটা প্লাস্টিকের জলের জগ, একটা থালা আর একটা ছেঁড়া মাদুর ও কম্বল। লোকটাকে দেখার পর থেকে কুর্চির মনে এই লোকটির প্রতি একটা সফট কর্নার তৈরি হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে একটা বয়স্ক মানুষ এত কষ্ট করে থাকে, এটা ভেবেই তার ভেতরে একটা দলা পাকানো কান্না গলার কাছে জমাট বেঁধে যায়। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে। সুরেশ কোনও রকমে একটা কালি পড়া হ্যারিকেন জ্বেলে এনে মেঝেতে মাদুরের ওপর বসে পড়ে। কুর্চি, বিতানও তার পাশে বসে। বাইরে তখন সন্ধে নেমেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ ছাড়া বাকি সকলেই নিশ্চুপ।

বিতান এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। চোখে তার জ্বলজ্বল করে অনেকগুলো প্রশ্ন। খুব চেনা মনে হয় বৃদ্ধকে। কোথায় যেন দেখেছে! মনে করতে পারে না। সুরেশও ছানি পড়া চোখে বিতানের মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটা বোঝার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর কাঁপাকাঁপা গলায় বলে, ''এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন বাবুজি?''

বিতান অবাক হয়ে যায় বৃদ্ধের কথা শুনে। কুর্চিও দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে। কোন রহস্য লুকিয়ে আছে বিতানের সঙ্গে? তারা কি আদৌ সেই রহস্যের সমাধান করতে পারবে, নাকি নতুন করে আবার কোনও রহস্যের ইন্দ্রজালে জড়িয়ে যাবে? কুর্চি ও বিতান কোনও কথা না বলে চুপ করে থাকে। সুরেশ থেমে থেমে বলে, ''নেহা দিদি কত অপেক্ষা করেছিল আপনার জন্য। অনেক অপেক্ষা। কিন্তু আপনি ফিরে আসেননি বাবুজি।''

বিতান অবাক হয়ে বলে, ''নেহা! নেহা কে? নেহা বলে তো আমি কাউকে

চিনি না।''

বিতানের কথা শুনে সুরেশের চোখে ক্রোধের আগুন খেলা করে। বলে, ''আপনি আপনার স্ত্রীকেই ভুলে গেছেন?''

বিতান নিজের মাথার চুল দু হাতে শক্ত করে ধরে চিৎকার করে কুর্চির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ''এই যে বসে রয়েছে, এইটা আমার একমাত্র বউ। কুর্চি। নেহা বলে কাউকে আমি চিনি না।''

বিতানের কথা শুনে সুরেশ এতটুকুও উত্তেজিত না হয়ে কুর্চির দিকে তাকিয়ে বলে, ''এটা আপনার বউ? হবে হয়তো। কিন্তু গতজন্মে নেহা দিদি আপনার—।''

চরম রাগের মাথায় এই বৃদ্ধের কথা শুনে হাসি পেল বিতানের। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলল, ''বাহ্, দারুণ গল্প। তা দাজু সকাল থেকে ক'বোতল মাল টেনেছেন শুনি? যত্ত সব গাঁজাখোরি গল্প!''

বিতান মাদুর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্চিকে বলে, ''চলো কুর্চি। এসব ফালতু গল্প শোনার সময় নেই। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে কেউ এ-সব বিশ্বাস করবে? আমার জীবনটা কি রামগোপাল ভর্মার ফিল্ম নাকি?''

বিতানের কথা শুনে রাগে ফুঁসতে থাকে সুরেশ। বলে, ''গতবার আপনি নেহা দিদিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। খুব খারাপ লোক আপনি। খুব খারাপ।''

বিতানের ইচ্ছে করছিল খুন করে ফেলে এই বৃদ্ধকে। কী সব উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলছে! কিন্তু বিতানের এই আচরণ ভালো লাগে না কুর্চির। আসলে এই বৃদ্ধ কেয়ারটেকারের কথায় এমন একটা কিছু ছিল, যা থেকে কুর্চির একবারও মনে হয়নি যে, সে মিথ্যে বলছে। কুর্চি বিতানকে কিছু না বলে নরম গলায় সুরেশকে প্রশ্ন করে, ''আপনি যা বলছেন, তার কোনও প্রমাণ আছে? কতদিন আগের ঘটনা বলছেন আপনি?''

সুরেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলে, ''চল্লিশ বছরের পুরনো একটা ঘটনা, যেটা আমার আজও মনে আছে।''

বিতান হেসে বলে, ''হয়েছে তো কুর্চি? চল্লিশ বছর আগের ঘটনা, যখন আমার জন্মই হয়নি! তখন নাকি আমার বউ ছিল নেহা। মামাবাড়ির আবদার। গল্পটা লেখা হলে টলিউড লুফে নেবে। পাবলিক হেব্বি খাবে।''

কুর্চি এক ধমক দেয় বিতানকে, ''কিচ্ছু শোনার ধৈর্য নেই তোমার? তবে গতকাল থেকে পাগলের মতো আচরণ করছিলে কেন? কেন এই দাজুর কাছে আসার জন্য ছটফট করছিলে? স্বপ্ন দেখার কথাটা ভুলে যেও না বিতান!''

কুর্চির কথা শুনে কিছুটা হলেও শান্ত হয় বিতান। আসলে সে মুখে যাই বলুক না কেন, মনে তখন তার তোলপাড় করা ঝড় চলছে। অঙ্কগুলো পরপর সাজিয়ে প্রাণপণে মিলিয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। স্বপ্নে দেখা পাহাড়ের ধারে সেই বাড়িটা সে খুঁজে পেয়েছে। যেটা সে বিয়ের পর থেকে প্রায় দেখত। তবে কী? তবে— মনে হতেই সে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল।

কুর্চি সুরেশকে জিজ্ঞাসা করে, ''চল্লিশ বছর আগে কী ঘটেছিল দাজু, প্লিজ আমাকে বলুন।''

সুরেশ, বিতানের এই আচরণে মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। তা ছাড়া সারাদিন অনাহারে অবসাদে সে ক্লান্ত। তাই কুর্চির কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। কুর্চি তার হাত দুটো ধরে নরম সুরে বলে, ''প্লিজ দাজু, বলুন আমাকে। আমরা যে অনেক আশা নিয়ে এসেছি। আমি আপনার মেয়ের মতো—।''

কুর্চির কথা শুনে রেগে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে সুরেশ। বলে, ''না, আমার কোনও মেয়ে নেই। আমার কেউ আপন নেই।'' বলেই কেঁদে ফেলে। তার পর একটু থেমে বলে, ''আমার শুধু নেহা দিদি ছিল। সে আমাকে দাদার মতো সম্মান করত। ভালবাসত। সেও আমাকে ছেড়ে চলে গেল!'' বলেই দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

কুর্চি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, ''কেন? কী হয়েছিল?''

কান্না জড়ানো গলায় হাঁটু থেকে মাথা তুলে সুরেশ বলে, ''খুব খারাপ ঘটনা ঘটেছিল তার সঙ্গে। খুব খারাপ।'' তার পর বিতানের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, ''শুধু এই লোকটার জন্য।'' তার পর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মাদুর থেকে। উত্তেজনায় সে তখন থরথর করে কাঁপছে। অশক্ত শরীরে চিৎকার বলে, ''আপনাদের আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তা হলে কেন এসেছেন আপনারা আমার কাছে? কী খুঁজতে এসেছেন? বেড়াতে এসেছেন, বেড়ান। তার পর চলে যান।'' বিতানের দিকে তাকিয়ে, ''আপ নেহা দিদিকি পতি বাননে কি লায়েক হি নেহি থে। অউর ওহ আপকো কিতনা পেয়ার

কারতি থি। কিতনা ইন্তেজার কিয়া আপকে লিয়ে। পার আপ—।''
কুর্চি আর বিতান তখন দু'জনেই বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। কে যে কী বলবে ভেবে পায় না। একটা অজানা ঝড়ের আশঙ্কায় জড় বস্তুর মতো বসে থাকে সুরেশের দিকে তাকিয়ে। যেন অতীত ইতিহাসের কোনও রহস্যময় কাহিনি উন্মোচিত হতে চলেছে, পাহাড়ের ধারে জঙ্গলের মধ্যে এই আলো আঁধারিতে ঘেরা ঘরটিতে। কুর্চির হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। কিছু সময় পর সুরেশ ঠান্ডা গলায় বলে, ''ইঁহাসে চলে যাইয়ে বাবুজি। বহুত রাত হো গ্যয়া।''
বিতান কাতর কণ্ঠে সুরেশের হাত দুটো ধরে বলে, ''সরি দাজু, আমাকে মাফ করুন। গত কয়েকদিন ধরে আমার সঙ্গে যা হচ্ছে— আমি মাথা ঠিক রাখতে পারছি না। আপনি প্লিজ বলুন কী হয়েছিল?''
সুরেশ বিতানের হাত থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে ভাঙা গলায় বলে, ''এর থেকে বেশি আমার পক্ষে আর কিচ্ছু বলা সম্ভব নয়। আপনারা চলে যান।''
কুর্চি হাতজোড় করে কাতর কণ্ঠে বলে, ''এতটা যখন বললেন, তখন বাকিটাও বলুন, প্লিজ। কী হয়েছিল নেহার সঙ্গে? আপনি চুপ করে থাকবেন না, প্লিজ।''
সুরেশ মনে মনে বিরক্ত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কুর্চির দিকে। বোধ হয় কুর্চির অসহায়তা এই অশীতিপর নেপালি বৃদ্ধও বুঝতে পারে। বলে, ''ইস কাহানিকা রাজ আপ লোগো কোহি ঢুন্ডনা হ্যায়। মুঝে নেহি পাতা।''
তার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ কী মনে হওয়ায় বলল, ''জলসা বাংলোকে বিচ মে এক বহুত পুরানা চার্চ হ্যায়। উস চার্চ মে ফাদার জোসেফ সায়েদ হ্যায়। বোহি কুছ—'' বলেই ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল সুরেশ।

১৮

সেই রাতটা যে কীভাবে কাটল, সেটা একমাত্র কুর্চি আর বিতানই জানে। সারারাত নানা দুশ্চিন্তায় দু' চোখের পাতা এক হয়নি। তবু মনের চাপে শরীরও এক সময় ক্লান্ত হয়ে যায়। তখন তার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। এমনটাই হয়েছিল কুর্চিদের। ভোর রাতে আর জেগে থাকতে না পেরে দু'জনেই ঘুমের দেশে তলিয়ে গেল।

বেশ বেলা করেই ঘুম ভাঙে দু'জনের। সেদিনও আকাশের মুখ ভার। রোদ ওঠেনি বলেই হয়তো তাদেরও ঘুম ভাঙেনি। চোখ খুলতেই কুর্চির নজর গেল জানলার বাইরে ঝুলে থাকা কালো মেঘটার দিকে। এমন উদ্বেগ ভরা বিষন্ন সকাল এর আগে তাদের জীবনে এসেছে কিনা মনে পড়ে না কুর্চির। নিজেকে বড় অপরাধী লাগে। যদিও কোনও সঙ্গত কারণ নেই, তবু—। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে দুলতে দুলতে সে ক্লান্ত। বুকের মধ্যে জমাট বাঁধা একটা চাপা কষ্ট। যেন তার সাধের সাজানো জীবন কেউ ছারখার করে দিতে এসেছে। অথচ একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, এ লড়াই হাওয়ার সঙ্গে। যে কোথাও নেই, অথচ আছে, এই লড়াই সেই না থাকার সঙ্গে।

বিতানও চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না কুর্চির দিকে। দু'জনেই যেন দু'জনকে এড়িয়ে চলছে। এক মুহূর্তের একটা ছোট্ট ঘটনা দু'জনের মধ্যে দূরত্বটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি। যা কিছু ঘটছে, তার জন্য সত্যিই কি সে দায়ী? কেন মন খুলে কথা বলতে পারছে না কুর্চির সঙ্গে? যদি সুরেশ দাজুর কথা বিশ্বাস করেই নেয়, তা হলে যা কিছু ঘটেছে, সে তো পূর্ব জন্মে। এ জন্মে কেন তার রেশ থেকে যাবে? মনে মনে ঠিক করে বিতান। শুরুটা যখন তাকে দিয়েই হয়েছে, তখন শেষটা তাকেই করতে হবে। তাই কুর্চির সঙ্গে তৈরি হওয়া সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় না রেখে সে বলে, ''তৈরি হয়ে নাও কুর্চি। আমাদের যেতে হবে।''

গলায় স্পষ্ট আদেশের সুর। এই বিতানকে বড় অচেনা মনে হয় কুর্চির। সে মুখে কোনও কথা না বলে তাড়াতাড়ি প্যাকিং করে নিজেও তৈরি হয়ে নেয়। যদিও তাদের আরও একদিন বুকিং ছিল, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না। তারা বেড়াতে আসার প্ল্যান করেছিল নিজেদের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্ব মুছে দিতে। একে অপরের সঙ্গে প্রকৃতির মাঝে একান্তে একটু সময় কাটাতে। আরও একটু ভালো লাগার, ভালবাসার জন্য। কিন্তু পরিণতি কী হল? দূরত্ব কম হল, নাকি যে-টুকু দূরত্ব ছিল, সেটা যোজন খানেক বেড়ে গেল? নেহার সঙ্গে কী ঘটেছিল, তা জানার জন্যই কি বিতান আকুল, নাকি নিজের আমিকে চিনতে পারাটাও তার কাছে একটা বড় বিষয়? মানুষ নিজেই তো নিজের কাছে সব থেকে বেশি আনপ্রেডিক্টেবল। অমীমাংসিত জীবনের উত্তরগুলো।

বিতান নীচের রিশেপসনে ফোন করে গাড়ি অ্যারেঞ্জ করতে বলে দিয়েছিল। ওরা ব্রেকফাস্ট করে যখন মরগ্যান হাউস থেকে বেরোয়, তখন বেলা গড়িয়ে এগারোটা। শুধু চলে যাওয়ার সময় গাড়িতে ওঠার আগে পিছন ফিরে বিতান বাড়িটাকে ভালো করে দেখছিল। যদি কিছু মনে পড়ে! যদি একবার সেই বৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়! দেখা হয় একবার—! দেখা হয় গতজন্মে ফেলে আসা নিজের সঙ্গে—!

কুর্চি গাড়ির ভেতর থেকে বলে, ''উঠে এসো বিতান।''

বিতান উঠে আসে গাড়িতে। কিন্তু তার মন বিষন্নতায় ভরে থাকে। যদিও কারণটা স্পষ্ট হয় না বিতানের কাছে। জীবন থেকে তার কিচ্ছু হারায়নি। যা কিছু সে এই জীবনে পেয়েছিল, তার সবটুকুই সুন্দরভাবে সাজানো আছে। তবু কোথা থেকে একটা আচমকা ঝড় এসে যেন সব কিছু তছনছ করে দিতে চাইছে। মরগ্যান হাউস থেকে জলসা বাংলো যেতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টার কাছাকাছি।

পুরো রাস্তাটা একমাত্র ড্রাইভার ছাড়া আর কেউই কোনও কথা বলল না। বাংলোর কাছাকাছি আসতেই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল এই বাংলোতে তাদের বুকিং আছে কিনা! আসলে এমন একটা বিষয় নিয়ে তারা এতক্ষণ ভেবে চলেছিল যে, জলসা বাংলোয় গিয়ে কোথায় থাকবে, আগে থেকে বুকিং করে যাওয়া উচিত কিনা, এসব নিয়ে কেউ একবারও মাথা ঘামায়নি। ড্রাইভারের কথা শুনে গাড়ির ভেতরের পরিবেশ কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হল। বিতান ড্রাইভারকে বলল, ''না, আমাদের বুকিং নেই। তবে গিয়ে বললে নিশ্চয় থাকতে দেবে।''

শুনে ড্রাইভার রাস্তার একপাশে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলে, ''স্যার, বুকিং ছাড়া আপনারা ওখানে যাচ্ছেন? ওখানে শুনেছি একমাত্র সরকারি লোকজনরা মাঝেমাঝে এসে থাকেন। এমনিই কোনও পাবলিককে তো থাকতে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া—।'' কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল ড্রাইভার। তার পর বলল, ''আপনারা যদি কোনও হোম স্টেতে থাকবেন তো বলুন, আমি সেখানে পৌঁছে দেব।''

ড্রাইভারের কথা শুনে খুব রাগ হয় বিতানের। হোম স্টেতে পুড়ে দিয়ে ব্যাটার কমিশন নেওয়ার ধান্দা! বিতান নিজের রাগ গোপন করে বলে, ''আমাদের

থাকা নিয়ে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। যেখানে যেতে বলছি চলো।''
কুর্চি অবাক হয়ে যায় বিতানের এহেন রূঢ় আচরণে। বিতান কি নিজেকে কন্ট্রোলে রাখতে পারছে না? এমন খারাপ ব্যবহার সে তো আগে কোনওদিন কারও সঙ্গে করেনি! কুর্চি তাড়াতাড়ি সুর নরম করে ড্রাইভারকে বলে, ''দাদা, জলসা বাংলোর কাছাকাছি যে চার্চটা আছে, আমাদের আগে সেখানে নিয়ে চলুন। চার্চটা একটু ঘুরে তার পর আমরা জলসা বাংলো যাব।''
ড্রাইভার কুর্চির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, ''জলসা বাংলোর কাছে চার্চ? ওখানে তো কোনও চার্চ নেই ম্যাডাম!''
বিতান তেড়ে ওঠে ড্রাইভারকে, ''বলে দিলেই হল যে চার্চ নেই? অবশ্যই আছে। ওখানে ফাদার—।''
কুর্চি চট করে বিতানের হাত টিপে ধরে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। তার পর আমতা আমতা করে বলে, ''আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ওর মাথা গরম।'' তার পর আলাপের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, ''তা দাদা আপনার বাড়ি কোথায়, এখানেই?''
ড্রাইভার জানায়, তার বাড়ি কালিম্পং শহরে। এ দিকে সে প্রায় দিন প্রচুর টুরিস্ট নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে কোনও চার্চ তার চোখে পড়েনি। তা ছাড়া কোনও চার্চ যদি থেকেও থাকে, তা হলে কোনও না-কোনও টুরিস্ট নিশ্চয় দেখতে চাইত। কুর্চি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে বলে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জলসা বাংলোর গেটে চলে আসে। গেটটা মেন রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। চারদিকে আর কোথাও কোনও জনপ্রাণী বা ঘরবাড়ি চোখে পড়ে না। গাড়ির ভেতর থেকে দিনের বেলায় বাইরেটা দেখেই কেমন যেন গা ছমছম করে কুর্চির। কী মরতে যে তারা এখানে এসেছিল! এত জায়গা থাকতে এই মরগ্যান হাউসে আসার প্ল্যানটা তারই ছিল। তবে যা কিছু তাদের জীবনে ঘটছে, তাতে আজ না হোক কাল আসতেই হত। কারণ ডেস্টিনিকে কেউ আটকাতে পারে না। ওরা গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারের টাকা মিটিয়ে দেয়। চলে যাওয়ার সময় তাও একবার ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে, ''আপনারা সিওর যে এখানেই থাকবেন? আজ পর্যন্ত কেউ এখানে—।'' বলেই থেমে গেল। আসলে এই সব জায়গার মূল ব্যবসা পর্যটন। পর্যটকদের মাধ্যমেই এদের যাবতীয় রুজি-

রোজগার হয়। কাজেই কোথাও যদি কোনও অপ্রীতিকর কিছু ঘটেও থাকে, তা হলে সেটা স্থানীয়রা বেমালুম চেপে যায়। না হলে তাদের পেটের ভাতে টান পড়বে। যাওয়ার আগে ড্রাইভার নিজের মোবাইল নাম্বারটা কুর্চিকে দিয়ে বলে, ''কোনও অসুবিধে হলে ফোন করবেন।'' এই বলে সে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

১৯

জলসা বাংলোর গেটটা যেখানে থেকে শুরু হচ্ছে, তার চারদিকেই সিঙ্কোনা গাছের গভীর জঙ্গল। গেট থেকে বাংলোটা দেখা যায় না। কুর্চি বিতানের দিকে তাকিয়ে বলে, ''আমরা কি ব্যাগপত্তর নিয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব? চলো দেখি থাকার ব্যবস্থা কী হয়?''

বিতান বাধা দিয়ে বলে, ''না কুর্চি, আমাদের হাতে সময় খুব কম। তা ছাড়া এমন কিছু বেশি লাগেজ আমাদের নেই। এই তো একটা ট্রলি আর তোমার একটা হ্যান্ড ব্যাগ। অসুবিধে হবে না। তার চেয়ে চলো দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা বরং সেই চার্চটা খুঁজে বের করি। একবার যদি ফাদারের সঙ্গে—।'' বলেই থেমে গেল।

জলসা বাংলো ছেড়ে ওরা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু পাহাড়ের এই চড়াই উতরাই আঁকাবাঁকা রাস্তায় কোথায় খুঁজবে চার্চ? তাও যদি নামটা জানা থাকত! তা ছাড়া রাস্তার ধারেপাশে যদি চার্চটা পড়ত, তা হলেও গাড়ির ড্রাইভার নিশ্চয় জানত। খুঁজতে খুঁজতে অনেকটা রাস্তাই তারা চলে আসে। কিন্তু চার্চ তো দূরের কথা, আশেপাশে কোনও জনবসতিও চোখে পড়ে না। সমতল রাস্তায় হাঁটা আর পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটা, ব্যাপারটা এক নয়। তাই কুর্চি ক্লান্ত হয়ে এক সময় পথের ধারেই বসে পড়ে। সেই কোন সকালে ব্রেকফাস্ট করেছে। তার পর আর কিছুই পেটে পড়েনি। আশেপাশে কোনও দোকান বা লোকজনও দেখা যাচ্ছে না।

কুর্চি বলল, ''আমি আর হাঁটতে পারছি না বিতান। ওই ড্রাইভারটাকেই বরং ফোন করি। চলো আমরা ফিরে যাই মরগ্যান হাউসে।''

বিতান বুঝতে পারে কুর্চির কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তার মাথায় তখন অদম্য জেদ

চেপে গেছে। সে বলে, ''তা হয় না কুর্চি, একবার ফিরে গেলে আর কিছুই জানতে পারব না। সারাজীবন ধরে এই অশান্তি ভোগ করা সম্ভব নয়।''

তার পর বিতানও কুর্চির পাশে রাস্তার ওপর বসে পড়ে। কুর্চির হাত দুটো ধরে বলে, ''আমার জন্য একটু কষ্ট করো কুর্চি। আমাকে ভুল বুঝো না।''

দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে। সঙ্গে থাকা জলও শেষ। আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই পথের ধারে চোখে পড়ল একটা ছোট্ট দোকান। সেখানে গিয়ে আগে জল খেয়ে খানিক সুস্থ হলে ওরা অর্ডার দিল দু'প্লেট করে ওয়াই ওয়াই আর অমলেট।

দোকানি তাড়াতাড়ি তাদের জন্য খাবার বানিয়ে এনে দিতেই তারা গোগ্রাসে সব খেয়ে ফেলল। খাওয়া শেষ হলে তারা দোকানিকে চার্চের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সেই দোকানিও তাদের তেমন কোনও আশার আলো দেখাতে পারল না।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বিতান বলল, ''আমার মনে হয় আমাদের জলসা বাংলোতেই যাওয়া উচিত। ওখানে গেলে নিশ্চয় কোনও একটা সূত্র ঠিক পাব, আমার মন বলছে।''

— ''সব বুঝলাম। কিন্তু রাতে থাকবে কোথায়? রাস্তার ওপর তো থাকা যায় না।''

— ''একটা না একটা ব্যবস্থা ঠিক হবেই। ভরসা রাখো।''

কুর্চি বুঝতে পারে না এই ভরসাটা ঠিক কার ওপর রাখার কথা বলছে বিতান। সে আর কথা না বাড়িয়ে বিতানকেই অনুসরণ করে। জলসা বাংলোকে পেছনে ফেলে ওরা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। কাজেই আবার যখন সেই বাংলোর কাছে ফিরে এলো, তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামার সময় হয়ে গেছে। বাংলোর গেটে কোনও প্রহরী নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ গেটটা দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন অব্যবহারে জীর্ণ। মরচে ধরে গেছে। বিতান ও কুর্চি ভেতরে ঢুকল। গেট থেকে বাংলো যাওয়ার কাঁচা রাস্তাটা এঁকে বেঁকে উপরে উঠেছে। রাস্তার এক পাশে বড় বড় গাছের ঝুরি নেমেছে, আর এক পাশে পাহাড়ের গায়ে সিঙ্কোনা গাছের গভীর জঙ্গল খাড়াই নেমে গেছে। সংকীর্ণ রাস্তা। একটু অসাবধান হলেই তলিয়ে যেতে হবে হাজার ফুট নীচে সিঙ্কোনার

জঙ্গলে। কুর্চি ও বিতান দু'জনেই জঙ্গল ভালবাসে। কিন্তু সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো মানসিকতা কারও তখন ছিল না। বাংলোর গেটে ঢোকার পর থেকেই কুর্চির বেশ গা ছমছম করতে শুরু করেছে। রাস্তাটা দেখলে বেশ বোঝা যায় লোকজনের যাতায়াত খুব কম। গেট থেকে বেশ অনেকটা ওপরে বাংলো।

ওরা কোনও রকমে ওপরে উঠে দেখল, গোল টেবিলের মতো সমতলভূমির ওপরে ছোট্ট একটা বাংলো। তার চারপাশে টেবিলের পায়ার মতো খাড়া পাহাড় নীচে নেমে গেছে। বাংলোর সামনে কিছু বড় বড় প্রাচীন গাছ মাথা তুলে একা একা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই। বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজে তখন চারপাশ পরিপূর্ণ। দূরের পাহাড়ে ছোট ছোট জোনাকির মতো আলো একের পর এক জ্বলতে শুরু করেছে। বিতান ও কুর্চি বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু কাছে যেতেই দেখে বাইরে থেকে সেটা তালা বন্ধ। বিতান কুর্চিকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে টিনের চাল দেওয়া একটা ছোট্ট বাড়ি তার চোখে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পর এক অতি বৃদ্ধা নেপালি মহিলা লাঠিতে ভর করে বেরিয়ে আসে। তার পর টর্চ হাতে বেরিয়ে আসে বছর ষাট-পঁয়ষট্টির একজন নেপালি লোক। নাম রাজেন শেরপা। নেপালি হলেও চোস্ত বাংলা বলে। বৃদ্ধা মহিলা সম্পর্কে তার মা।

দু'জনেই বিতানের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কারণ এমন সন্ধেয় সাধারণত কোনও টুরিস্ট এখানে বেড়াতে আসে না। তা ছাড়া কালে-ভদ্রে যে গুটিকয়েক সরকারি লোকজন আসে, তারা আগে থেকে খবর দিয়ে অনেকজন মিলে আসে। সে কথা বলতেই বিতান বলে, ''আমরা খুব বিপদে পড়ে এখানে এসেছি। দয়া করে যদি আজকের রাতটা এখানে থাকতে দেন।''

কিন্তু রাজেন নামক লোকটি কিছুতেই বিতানকে সেখানে থাকতে দিতে রাজি নয়। এমনকী, কারণটাও স্পষ্ট করে বলে না। লোকটি খুব একটা মিষ্টভাষী নয়। হতে পারে এমন পরিবেশে একা থাকতে থাকতে তার সমস্ত রসবোধ উধাও হয়ে গেছে। তাদের উত্তপ্ত কথা বিনিময়ের ফাঁকেই কুর্চি এসে পড়ে সেখানে।

হঠাৎ কুর্চি বলে বসে, ''এখানে আমাদের ফাদার জোসেফ পাঠিয়েছেন।'' সেই কথা শুনে রাজেন প্রচণ্ড বিস্মিত হয়ে কুর্চির দিকে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। চোখে তার অনেক প্রশ্ন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তার পর কী মনে হওয়ায় হনহন করে ঘরের ভেতর থেকে চাবি এনে বাংলোটা খুলে দেয়।

ঘরের ভেতরের অবস্থা খুব একটা মন্দ নয়। চারদিকে কাচের জানালা। পর্দা দেওয়া। তবু অনেকদিন অব্যবহারের ছাপ স্পষ্ট। অধিকাংশ জায়গায় লাইট নেই। যে কয়েকটি জায়গায় আছে, তাদের আলো অত্যন্ত ম্লান। সে যাই হোক, একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই তো আপাতত পাওয়া গেছে। কুর্চি কোনও মতে সেই রাতের মতো একটা রুমকে থাকার বাসযোগ্য করল।

একবার ভাবল, এমন একটা জায়গায় থাকার আগে তার জামাইবাবু কর্নেল মিশ্রকে একবার ফোন করে। আসলে এই ভূতুড়ে পরিবেশ থেকে কুর্চি পালাতে চাইছিল। কিন্তু ফোন করতে গিয়ে দেখে একটা নেটওয়ার্কও নেই। এদিকে দেখতে দেখতে রাত সাড়ে সাতটা-আটটা বেজে যায়।

পাহাড়ি এলাকায় আটটার মধ্যেই সকলে খেয়ে শুয়ে পড়ে। দু'জনেরই বেশ খিদে পেয়েছে। সঙ্গে থাকা ড্রাই ফুড অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কুর্চি ইতিমধ্যেই গোটা ঘর ভালো করে খুঁজে দেখেছে। কিচেন বলে আলাদা করে কিছু নেই। থাকলে অন্তত সেখানে কোনও একটা ব্যবস্থা করা যেত। যারা এখানে আসে, তারা হয়তো অন্য কোনও ভাবে খাওয়ার অ্যারেঞ্জ করে। বিতান বলে, ''সারারাত এভাবে না খেয়ে থাকা যায় না। তার চেয়ে চলো, দু'জন মিলে পাশের ওই রাজেন শেরপার ঘরেই যাই। যদি কিছু ব্যবস্থা করে দেয়।''

কুর্চির বাইরে বেরোতে ভয় করলেও খিদের কাছে সব তুচ্ছ হয়ে যায়। আকাশে মেঘ থাকলেও সেদিন বৃষ্টি হয়নি। তাই কালো মেঘের ফাঁকে চাঁদের আলো-আঁধারি খেলা চলছিল। ওরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে মোবাইলের আলো জ্বেলে রাজেনের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। গোটা চত্বরে কোথাও কোনও আলো চোখে পড়ে না। জায়গাটা অন্ধকারে এক গভীর শূন্যতায় ভরে রয়েছে। তারা ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় দু-তিনটে টোকা দিতেই সেই বৃদ্ধ নেপালি মহিলা বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গেই ছিটকে বেরিয়ে আসে ঘরের ভেতর টিমটিম করে

জ্বলা একটা হলুদ বাল্বের আলো। বিতান বলে, ''খানেকে লিয়ে কুছ মিলেগা চাচি? বহত ভুক লাগা।''
বৃদ্ধা কোনও উত্তর না দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে একটা বাটিতে কিছুটা ভাত ও ট্যালটেলে ডাল এনে বিতানের হাতে দিতেই রাজেন বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। রাজেনকে দেখে বিতান প্রশ্ন করে, ''আপনার মা কি কথা বলতে পারেন না?''
জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিতানের দিকে তাকায় রাজেন। বলে, ''চল্লিশ বছর আগে আমার মা এই পাহাড় থেকে একটা বাঙালি মেয়েকে চোখের সামনে পড়ে যেতে দেখেছিলেন। যদিও আমি দেখিনি। মা খুব ভালোবাসতেন মেয়েটিকে। সেই ঘটনার পর থেকে মা আর কোনওদিন কথা বলেননি!''
সেই খাবার হাতে নিয়ে কুর্চি ও বিতান পস্পরের দিকে একবার তাকায়। সেই তাকানোর অর্থ হয়তো তারা নিজেরাও বুঝতে পারে না। তার পর দ্রুত পা চালিয়ে বাংলোর ভেতর ফিরে এসে কোনও মতে সেই ডাল–ভাত খেয়ে নেয়। এই রকম দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে দু'জনের কথাও যেন হঠাৎ করে ফুরিয়ে গেছে। তা ছাড়া তীব্র ঠান্ডায় এমন অপরিচিত ভয়ঙ্কর পরিবেশে ঘুমোতেও যেন ভয় লাগে। তবু সারাদিনের ক্লান্তিতে দু'জনেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ ঘরের ভেতর একটা দমকা ঠান্ডা হাওয়ায় বিতানের ঘুম ভেঙে যায়।

বাইরের বারান্দায় একটা হলুদ রঙের ম্লান আলো জ্বলছিল। বিতানের চোখ যায় জানলার দিকে। দেখে সেখানে পর্দাটা সরে গিয়ে জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। অথচ তার স্পষ্ট মনে আছে, শোবার সময় সে সমস্ত জানলা–দরজা ভালো করে লাগিয়ে পর্দা টেনেই শুয়েছিল!
কুর্চিকে না জাগিয়ে নিজেই উঠে জানলা বন্ধ করতে যায়। কিন্তু জানলার কাছে গিয়ে দেখে, বাইরে দরজার কাছে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে হালকা হলুদ একটা সালোয়ার কামিজ, গায়ে লাল ওড়না। আলো অন্ধকারে মুখটা ভালো করে দেখা যায় না। এত রাতে এই মেয়েটা কে? বিতানের শরীরের সমস্ত রোমকূপ শিহরিত হয়ে ওঠে। একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে যায় গোটা শরীরে। পেছন ফিরে কুর্চিকে ডাকতে যাবে এমন সময় আবার জানলার দিকে তাকাতেই দেখে কেউ কোথাও নেই। অবাক হয়ে যায় বিতান। এইমাত্র তো ছিল! গেল কোথায়?

মেয়েটা যদি নেহাই হয় তা হলে এই লড়াই একান্তই বিতানের নিজস্ব। সেখানে কুর্চির স্থান নেই। যে এসেছিল, সে যদি তার পূর্বজন্মের স্ত্রী হয়েই থাকে, তা হলে বিতানের তো ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আচ্ছা, এই ছায়ামূর্তি কি তাকে কিছু বলতে চায়? সাহসে ভর করে সে হাতে মোবাইলটা নিয়ে বাইরে বেরোল। কিন্তু বাইরের নিঃসীম অন্ধকারে একমাত্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। সে ঘরে ফিরে এসে কুর্চির পাশে শুয়ে পড়ল। সে রাতে তার আর ঘুম হল না।

২০

পূবের আকাশে তখন সদ্য রং ধরেছে। সারারাত ধরে বিতানের মনে চেপে থাকা জমাট ভাবটা ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা কেটে গেছে। একমাত্র সূর্যের আলোই আমাদের সমস্ত মন খারাপের অবসান ঘটায়। কুর্চি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পাখিরা সদ্য জাগতে শুরু করেছে। বিতান গায়ে একটা মোটা চাদর চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। পূবের আকাশে লাল রং দেখা দিলেও চারপাশে এখনও কিছু কিছু জায়গায় গাঢ় অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। পাহাড়ের কিনারার ধারে জিওল গাছের নীচে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল বিতান। সরু সরু ঠান্ডা হাওয়া তার চাদর ভেদ করে ঢুকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সামনের পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছু জনপদে লাইট তখনও মোনালিসার বুকের উপত্যকায় নেকলেসের মতো জ্বলজ্বল করছে। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় বিতানের মনটাও বেশ শীতল হয়ে আসে। সারা রাত না ঘুমোনোর ফলে চোখের পাতা ভারী হয়ে যায়। বেঞ্চে হেলান দিতেই একটু ঢুলুনি আসে চোখে। এমন সময় হঠাৎ কী মনে হওয়ায় চোখ খুলে দেখে পাহাড়ের প্রান্তরে তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রাতের সেই নারী মূর্তিটি। ভোরের আবছা আলো-আঁধারিতে বিতান দেখে ২৪-২৫ বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে। পরনে গত রাতের পোশাক। মুখখানা সুন্দর হলেও বেশ মায়াবি। পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা যায়, সেই মুখে একটা তীব্র অভিমান ও কষ্টের ছাপ। বিতান এক মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। নিজের প্রতি তার কোনও কন্ট্রোল থাকে না। অস্ফূট স্বরে বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলে, 'নেহা!'

যেন ভোরের আলো-আঁধারিতে তার সমস্ত অতীত বর্তমান মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতের ঝলকানির মতোই যেন তার সব কিছু মনে পড়ে যায়। বেঞ্চ থেকে উঠে যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে যায় নেহার দিকে। এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় দেখে, অসাবধানতাবশত নেহা পা পিছলে পাহাড়ের গা বেয়ে গভীর খাদে পড়ে যেতে যেতে শূন্যে মিলিয়ে যায়। তাকে আর কোথাও দেখা যায় না। পাহাড়ের নীচের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে বিতান, ''নেহাআআআআআ—।''

ঠিক সেই মুহূর্তে কুর্চি এসে পিছন থেকে ধরে না নিলে বিতানও হয়তো পড়ে যেত সেই গভীর খাদে। কেউ আর কোনও দিন বিতানের খোঁজ পেত না।

কুর্চিকে দেখে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে বিতান। একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো। কুর্চির কোলে মুখ গুঁজে পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, ''নেহা, আমার নেহা, এইমাত্র আমার চোখের সামনে খাদে পড়ে গেল কুর্চি। আমি বাঁচাতে পারলাম না। নেহা আমাকে ছেড়ে চলে গেল।'' তার পর কুর্চিকে ধরে বলে, ''নেহাকেই আমি রোজ রাতে স্বপ্নে দেখতাম কুর্চি। কিন্তু আমি চিনতে পারিনি।'' বলেই মাটির ওপর বসে কাঁদতে থাকে বিতান। কুর্চি জড়িয়ে ধরে বিতানকে শান্ত করার চেষ্টা করে। বিতানের সঙ্গে সে-ও কেঁদে ফেলে।

বেশ কিছুক্ষণ পর রাজেনের ডাকে সংবিৎ ফেরে কুর্চির। দিনের আলো তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কুর্চি দেখে, রাজেন হাতে দু'কাপ চা নিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভোরে বাংলোর বাইরে এই অবস্থায় মাটিতে বসে দু'জনকেই কাঁদতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। কোনও প্রশ্ন না করে মনের মধ্যে অনেকখানি জিজ্ঞাসা নিয়ে সে চলে যায়।

চা খেয়ে কুর্চি ও বিতান কিছুটা সুস্থ হয়। বিতান যেন সদ্য স্বজন হারানোর শোকে দুঃখে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কুর্চি বিতানের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ''ওঠো বিতান, ফ্রেশ হবে চলো। আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। আমাদের জানতেই হবে কী ঘটেছিল নেহার সঙ্গে!''

বিতান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কুর্চির দিকে। যেন সে বুঝতে পারে না কুর্চি কী বলছে! তার পর ঘরে ফিরে তারা ফ্রেশ হয়ে নেয়। জলখাবারের চিন্তা

না করে ব্যাগপত্তর ভেতরে রেখেই তারা বেরিয়ে পড়ে। কয়েক পা এগোতেই দেখা হয়ে যায় রাজেনের সঙ্গে। রাজেনই প্রথম কথা শুরু করে, ''আপনারা কি চলে যাচ্ছেন?''

উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার জিজ্ঞাসা করে, ''আচ্ছা গতকাল বলেছিলেন, আপনাদের ফাদার জোসেফ পাঠিয়েছেন। কিন্তু কোন ফাদার জোসেফের কথা বলছেন?''

কুর্চি তখন ধরা পড়ার ভয়ে আমতা আমতা করে বলে, ''এই সামনে যে চার্চ আছে, সেখানকার ফাদার জোসেফ।''

এ কথা শুনে রাজেনের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। সে তখন ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, ''ঠিক করে বলুন তো আপনারা কে? কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?''

প্রমাদ গোনে কুর্চি। বিতান কোনও কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। তার মাথা তখন অসহ্য যন্ত্রণায় ভারী হয়ে গেছে। কুর্চি আর অন্য কোনও উপায় না দেখে সংক্ষেপে সমস্ত কাহিনি খুলে বলে।

রাজেন সব শোনার পর বেশ অবাক হয়ে যায়। তার পর বলে, ''এখান থেকে কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে একটা অরফ্যান হাউস সংলগ্ন ক্যাথলিক চার্চ আছে। ফাদার জোসেফ খুব কষ্ট করে ওই অরফ্যান হাউস চালাতেন।''

কুর্চি মাঝপথে রাজেনকে থামিয়ে বলে, ''চালাতেন মানে? এখন কি সেই অরফ্যান হাউস বন্ধ হয়ে গেছে?''

রাজেন বলে, ''না, বন্ধ হয়নি। কোনও মতে চলছে। একবেলা আধপেটা খেয়ে থাকে বাচ্চাগুলো।''

বিতান জিজ্ঞাসা করল, ''আর ফাদার জোসেফ? তিনি কোথায়?''

রাজেন নিস্পৃহ স্বরে বলে, ''ছ'বছর হয়ে গেল ফাদার জোসেফ মারা গেছেন। বড় ভালো আর দয়ালু মানুষ ছিলেন। অনাথ বাচ্চাদের বড্ড ভালবাসতেন। আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আমি কালিম্পং থেকে এনে ফাদারের হাতে দিতাম। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।''

রাজেনের কথা শুনে দু'হাতে মাথার চুল আঁকড়ে ধরে বিতান বলে, 'তিনিই আমাদের শেষ ভরসা ছিলেন। আর কোনও উপায় নেই।''

রাজেন বলে, ''ওই চার্চে এখন আছেন ফাদার স্যামুয়েল। সাউথ ইন্ডিয়ান। তিনিও খুব ভালো মানুষ। আপনারা চাইলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।''

কুর্চি বলে, ''আপনি প্লিজ বলুন চার্চের রাস্তাটা কোনদিকে! আমরা এখনই একবার সেই চার্চে যেতে চাই।''

রাজেন তখন একটু এগিয়ে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু একটা রাস্তা দেখিয়ে বলে, ''এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মিনিট কুড়ি সময় লাগবে। যদিও রাস্তাটা খারাপ। কিন্তু আমরা এই পথ দিয়েই যাতায়াত করি। শর্টকাট। বাই রোড গেলে অনেক ঘুরতে হবে।''

২১

পাহাড়ি রাস্তা ধরে বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে যায় সেই চার্চে। বহু পুরনো ইংরেজ আমলের একটা চার্চ। পরিচর্যাহীন। আকারে ছোট।

ওরা ভেতরে ঢুকতেই দেখল বিভিন্ন বয়সি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের প্রাতঃকালীন প্রার্থনা করছে। ডায়াসের ওপর সাদা ড্রেস পরিহিত ফাদারও বাচ্চাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন। যিশুর ক্রুশের সামনে জ্বলছে মোমবাতি ও সুগন্ধী ধূপ। চার্চের ভেতরে তখন এক স্বর্গীয় পরিবেশ। বিতান ও কুর্চি একটা ফাঁকা বেঞ্চে গিয়ে বসল। প্রার্থনা গানের পর শুরু হল বাইবেল পাঠ। শেষে বাচ্চারা একে একে লাইন দিয়ে বাইরে চলে যায়। চার্চ সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেলে কুর্চি ও বিতান এগিয়ে যায় ফাদারের কাছে। বিতান কাতর কণ্ঠে বলে, ''প্লিজ হেল্প মি ফাদার। আই অ্যাম ইন টু মাচ ট্রাবেল।''

ফাদার স্যামুয়েলের বয়স প্রায় আশি পেরিয়ে গেছে। মাথা ভর্তি সাদা চুল। তিনি সাউথ ইন্ডিয়ান হলেও দীর্ঘদিন বাংলাতেই রয়েছেন। কাজেই বেশ ভালো বাংলা বলেন। তিনি বিতানের মাথায় হাত রেখে বলেন, ''তোমার সব কথা তুমি জেসাসকে বলো। তিনি অবশ্যই তোমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।''

কুর্চি বলে, ''আমরা খুব অপারগ হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

ফাদার জোসেফের বিষয়ে আপনি যদি প্লিজ একটু হেল্প করেন।'' কুর্চির কথা শুনে অবাক হন ফাদার স্যামুয়েল। তিনি বলেন, ''ফাদার জোসেফ তো কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। তার পরই তো আমি এই চার্চের দায়িত্ব নিয়ে আসি। কিন্তু তাঁর বিষয়ে আমি কীভাবে তোমাদের হেল্প করব?''

কুর্চি আশান্বিত হয়ে বলে, ''জানি আমরা অন্যায় আবদার করছি। বলতে পারেন আলেয়ার পেছনে দৌড়চ্ছি। তবু—। আচ্ছা তিনি যে রুমটায় থাকতেন সেটা কি একবার দেখা যায়? মানে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র যদি—। তাঁর রুমে কি এখন কেউ থাকেন?''

ফাদার স্যামুয়েল বলেন, ''না, তিনি মারা যাওয়ার পর থেকে রুমটা তালাবন্ধই পড়ে থাকে। সেখানে এখন কেউ থাকে না। আমি অবশ্য তাঁর রুমে কখনও ঢুকিনি। তাই বলতে পারব না কী আছে, না আছে! কিন্তু তোমরা তাঁর রুম দেখতে চাইছ কেন?''

তখন কুর্চি ও বিতান একে একে সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে। সব শুনে ফাদার স্যামুয়েল জেসাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ''এও কি সম্ভব ঈশ্বর? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই রকম ঘটনা!''

তার পর কুর্চি ও বিতানকে চার্চের ওপর তলায় নিয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট রুম খুলে দিয়ে বলেন, ''এটাই ফাদার জোসেফের রুম। দ্যাখো কিছু পাও কি না!'' বলেই তিনি চলে যান।

ঘরটা খুলতেই বহু দিনের পুরনো একটা গন্ধ বেরিয়ে আসে। ঘরে ফাদার জোসেফের ব্যবহৃত দৈনন্দিন জিনিসপত্র আর কিছু পুরনো বাইবেল ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই চোখে পড়ে না। পুরো ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও যখন কিছুই চোখে পড়ল না, তখন তারা হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় বিতান রুমের ভেতর ঢুকে একে একে সব বাইবেলগুলো নামিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকে। আর সেখানেই সে পেয়ে যায় মেরুন কালারের একটা বহু পুরনো ডায়েরি। ডায়েরিটা তাড়াতাড়ি হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতেই ধূসর হয়ে যাওয়া কালিতে যে হাতের লেখাটা বিতানের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেটা তার খুব পরিচিত। যেন সে এর আগে বহুবার এই হাতের লেখা দেখেছে। ডায়েরিটা নিয়ে ফাদারের ঘরের মেঝেতেই বসে পড়ে কুর্চি ও বিতান।

২২

১৬ মার্চ (সন্ধে ছটা)

ডায়েরি লেখার অভ্যেস আমার কোনও কালেই ছিল না। কীভাবে লিখতে হয়, সেটাও আমার জানা নেই। কিন্তু ইদানীং কেমন যেন মন খারাপ করে। কীসের জন্য করে, তা-ও ঠিক বুঝতে পারি না। সন্ধের পর থেকে খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ফাদারকে সেদিন মন খারাপের কথা বলতেই আমাকে এই মেরুন কালারের ডায়েরিটা দিলেন। বললেন, ''মনে যা আসবে, তাই লিখবি। তোর ভালো লাগা, মন্দ লাগা —সব কিছু। দেখবি এই ডায়েরিটাই একদিন তোর সব থেকে ভালো বন্ধু হবে।''

১৮ মার্চ (বিকেল ৩টে)

একটু আগেই কলেজ থেকে ফিরলাম। ফাদারকে দেখলাম নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন। রোজ কলেজ না গেলে ফাদার বকাবকি করেন। চার্চ থেকে কিছু দূরে সুন্দর একটা রাস্তা আছে। দু'পাশে ঘন পাইন গাছ। সেই সবুজের ভেতর দিয়ে সাদা মেঘের ভেসে বেড়ানো দেখতে খুব ভালো লাগে। একটু পরে সেখানেই বেড়াতে যাব।

২৫ মার্চ (সকাল ১১টা)

আজ একটু নিজের কথা লিখি। আমি ছোট থেকে পাহাড়ের এই ছোট্ট অরফ্যান হাউসেই বড় হয়েছি। আমি জানি না আমার মা-বাবা কে! কেন তারা আমাকে এই চার্চে ফেলে রেখে গেছেন! জন্মের পর থেকে ফাদার জোসেফই আমাকে প্রতিপালন করেছেন। আরও অনেক বাচ্চার সঙ্গে আমি বড় হলেও ফাদার আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। একটু বড় হওয়ার পর থেকে নিজের পড়াশোনার

ফাঁকে বিভিন্ন কাজে আমি ফাদারকে সাহায্য করি। তিনি খুব কষ্ট করে এই অরফ্যান হাউস চালান। বিদেশি সংস্থা থেকে বেশ কয়েকবার টাকা পেলেও সেটা যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি পাহাড়ের গ্রামে ঘুরে ঘুরে টাকাপয়সা, খাবার, পুরনো জামাকাপড় জোগাড় করেন। অনাথ শিশুদের সেবা করাই তাঁর জীবনের ব্রত। দিনের শেষে নিজের ছোট্ট ঘরে গিয়ে ফাদার যখন বিশ্রাম নেন, আমিও তাঁর কাছে গিয়ে গল্প করি। ফাদারকে মনে হয় যেন মস্ত বড় একটা বটগাছ। কত অনাথ বাচ্চাকে তিনি তাঁর ভালবাসার আশ্রয়ে মানুষ করছেন! একটা কথা তিনি আমাকে প্রায় বলেন, 'দেখবি নেহা, একদিন তুই সব ফিরে পাবি। তোর মা তোকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু যেদিন তুই মা হবি, সেদিন বুঝবি মাতৃত্ব কী জিনিস!''
আমি কিছু বুঝি। সবটা বুঝতে পারি না।

৭ এপ্রিল (রাত্রি ১১টা)

আগামিকাল থেকে থার্ড ইয়ার ফাইনাল। তাই নো ডায়েরি লেখালিখি।

২৭ জুন (রাত্রি ৮টা)

জীবনের এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যে, অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে। জানি না এই ডায়েরি কেউ পড়বে কিনা। মনের ভেতর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, যেটা আগে কখনও হয়নি। কাকে বলব বুঝতে পারছি না। তাই ডায়েরি লিখছি। আজ বিকেলে পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অন্যদিনের মতোই একা। একটা ছেলেকে দেখলাম। পাহাড়ের ধারের বেঞ্চে একা একা চুপচাপ বসেছিল। বেশ অদ্ভুত। দারুণ দেখতে ছেলেটাকে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। কিন্তু কথা হল না।

২৮ জুন (সন্ধে সাড়ে সাতটা)

আজ বিকেলে আবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছেলেটা ওই বেঞ্চেই বসেছিল। আমি কাছাকাছি যেতে সে নিজেই এগিয়ে এসে পরিচয় করল। নাম নিশীথ চ্যাটার্জি। কার্শিয়াংয়ের বাগোড়ায় এয়ার ফোর্সে চাকরি করে। কয়েকদিনের ছুটিতে কালিম্পংয়ে পিসির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। দারুণ হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, সোভার। টুকটাক কথা হওয়ার পর আমি চলে এলাম।

২৯ জুন (সন্ধে সাড়ে ছটা)

আজ আবার দেখা হল। কথা হল। নিশীথ বেশ মিশুকে। আমরা দু'জন খুব তাড়াতাড়ি ভালো বন্ধু হয়ে গেছি। আজ আর লিখব না। ফাদার ডাকছেন।

৩০ জুন (বিকেল সাড়ে পাঁচটা)

আজ নিশীথের সঙ্গে দেখা হল না। বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে বেরোলে ফাদার বকা দেবেন। আচ্ছা আমি কি প্রেমে পড়েছি? না হলে এত অস্থির লাগছে কেন? কেন মনে হচ্ছে এক ছুটে নিশীথের কাছে চলে যাই। —উঁহু, এত সহজে নেহা কারও প্রেমে পড়ে না। নিশীথ নিশ্চয় আমার প্রেমে পড়েছে। না হলে রোজ রোজ আমার জন্য ওই একই জায়গায় অপেক্ষা করে কেন? তা ছাড়া আমিই বা কেন যাই রোজ রোজ নিশীথ চ্যাটার্জির কাছে। বেশ গোলমেলে ব্যাপার তো!

১ জুলাই (দুপুর দুটো)

আজ যদি বৃষ্টি না পড়ে তা হলে বিকেলে নিশীথের সঙ্গে দেখা হবে। আচ্ছা, আমি গতকাল যাইনি বলে কি নিশীথ রাগ করেছে? কিন্তু কীভাবে যাব? বৃষ্টি পড়ছিল যে! নিশীথ আছে, না ফিরে গেছে? দেখা যাক বিকেলে কী হয়!

(রাত সাড়ে আটটা)

আজ আমি আর নিশীথ অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসেছিলাম। ওই প্রথম ও আমার হাতে হাত রাখে। ওর সান্নিধ্য আমার খুব ভালো লাগছিল। ওর কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা আমার অরফ্যান হাউসে বড় হওয়ার সমস্ত দুঃখ মুছিয়ে দিচ্ছিল। নিশীথের ছুটি শেষ। ও কাল ফিরে যাচ্ছে। আর কি কখনও দেখা হবে নিশীথের সঙ্গে? আমি কি তবে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছি নিশীথকে? না হলে আমার ভেতরে এত কষ্ট হচ্ছে কেন? কথা বলতে বলতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই অন্ধকারেও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, চলে আসার সময় নিশিথের গলা ভারী হয়ে এসেছিল। চোখের কোণে জল চিকচিক করছিল।

৮ জুলাই (বিকেল পাঁচটা)

মনটা ভালো নেই। তাই এই ক'দিন ডায়েরি লিখিনি। নিশীথ বলেছিল চিঠি লিখবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও চিঠি আসেনি। আজ সকালে ফাদার জিজ্ঞাসা করছিলেন, কেন আমি মনমরা? কেন এই ক'দিন পাহাড়ের ধারে বিকেলে বেড়াতে যাইনি? কিন্তু আমি কী বলব!

(রাত নটা)

আজ সন্ধেয় ফাদারকে নিশীথের ব্যাপারে সব কথা বললাম। এমনকী, নিজের মনের কথাও। কিন্তু নিশীথ কি ফিরে আসবে?

২৫ জুলাই (সকাল দশটা)

সামনের মাসেই আমার বিয়ে। আমি কখনও ভাবিনি নিশীথের মতো এত ভালো ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে! নিশীথকে নিয়ে একটা অনিশ্চয়তার কালো মেঘ মনে মনে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু ও নিজেই ওর পিসিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ফাদারের কাছে। ওর বাবা–মা অনেক আগেই মারা গেছেন। পিসির কাছেই মানুষ। সামনের মাসে আমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। তার পর সবাই মিলে একটা পার্টি।

৩ অগস্ট (দুপুর আড়াইটে)

বিয়ের পর ভেবেছিলাম নিশীথের কাছেই থাকব। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের ওখানে ফ্যামিলি অ্যালাও নেই। তাই আমি নিশীথের পিসিমার বাড়িতেই রয়েছি। তিনি বৃদ্ধ মানুষ। শরীরও খারাপ। আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ করেন। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, খুব গুছিয়ে পরিপাটি করে সংসার করার। তাই নিশীথ যখনই ছুটি নিয়ে বাড়ি আসে, আমার জন্য অনেক জিনিস আনে। পিসিমা কিছুতেই বাধা দেন না। ফাদার নিশীথকে অনুরোধ করেছিলেন, অরফ্যান হাউসের বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য আমাকে যেন কিছুটা ফ্রি টাইম দেওয়া হয়। তাই হাতে তেমন কাজকর্ম না থাকলে আমি প্রায় দিন চার্চে ফাদারের কাছে চলে যাই। আমি চলে আসায় ফাদারের ওপর চাপ আরও বেড়েছে।

১৮ অগস্ট (সকাল ১০টা)

আমি কখনও কালিম্পং শহরের বাইরে যাইনি। কেই বা নিয়ে যাবে! অথচ আমি বেড়াতে খুব ভালবাসি। নিশীথ আমার সেই সাধ পূরণ করেছে। আমরা দু'দিনের জন্য হানিমুনে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে তিস্তা নদীর ধারে এক মাসির দোকানে মোমো খেলাম। এর আগেও অনেক জায়গায় খেয়েছি। কিন্তু মাসির হাতের মোমোর তুলনা নেই। মাসির নাম ফুলি। খুব ভালো মানুষ। নিশীথ তো দু'প্লেট খেল। আরও দু'প্লেট সঙ্গে নিয়েছিল। শান্তিনিকেতন খুব ভালো লেগেছে। বিকেলে গিয়েছিলাম ভুবন ডাঙার মাঠে। লাল মাটি আমি আগে কখনও দেখিনি। লাল মাটির খোয়াইয়ে সবুজের জঙ্গলে নিশীথের হাত ধরে হাঁটা এ জীবনে এক পরম প্রাপ্তি। ফেরার পথে আবার ফুলিমাসির দোকানে নেমেছিলাম। নিশীথ ফুলি মাসিকে বলল, ওইরকম মোমো বানানো আমাকে শিখিয়ে দিতে। সত্যি! আমি যদি এমনি মোমো বানাতে পারতাম!

২৫ অগস্ট (বিকেল ৫টা)

নিশীথের খুব ইচ্ছে ইংরেজ সাহেবের বাংলো দেখার। ফাদারকে সে-কথা বলতেই ফাদার মরগ্যান হাউসে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। তবে খাওয়াদাওয়ার খুব অসুবিধা। এখানে এক নেপালি কেয়ারটেকার আছে। সুরেশদা। আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছি। তিনিই এখন আমাদের নানা রকম নেপালি ডিশ রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। নিশীথটা এই বিকেলেও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আর আমি ডায়েরি লিখছি। আজ তিনি সুরেশদাকে অর্ডার করেছেন মুর্গ মসল্লম বানাতে। আমি তো রান্নায় অষ্টরম্ভা। তবে সুরেশদাকে আমি রান্নায় অবশ্যই সাহায্য করব। আজ সকালে একটা মনেস্ট্রিতে গিয়েছিলাম।

৬ সেপ্টেম্বর (সকাল ১০টা)

এখন আমি মরগ্যান হাউসের ঠিক পেছনের লনে বসে ডায়েরি লিখছি। আমার সামনেই একটা ছোট্ট শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। আমি কিছু টাটকা ফুল তুলে সাজিয়ে দিলাম। এ নিয়ে তিনবার আসা হল এই হাউসে। বাড়িটা নিশীথের খুব পছন্দ হয়েছে। এবারে আমি আর নিশীথ সুরেশদার বাড়ি গিয়েছিলাম। খুব ভালো মানুষ সুরেশদা। বিয়েথা করেনি। বেশ অদ্ভুত জায়গায় বাড়ি সুরেশদার। মরগ্যান হাউসের পেছন দিকের রাস্তা দিয়ে সোজা নেমে গেলেই জঙ্গল, আর তার ভেতরে ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি। সে আর তার মা থাকে। নিশীথ তো বলেছে, পরের বার এসে সুরেশদার বাড়িতেই থাকবে।

২৫ সেপ্টেম্বর (রাত নটা)

আজ সকালে পিসিমা মারা গেলেন। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। বিয়ের পর থেকে তিনি আমাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। নিশীথ আসতে পারেনি। স্থানীয় লোকেরাই সৎকার করল। এখন এত বড় বাড়িতে আমি কী নিয়ে থাকব!

১৬ অক্টোবর

খুব চিন্তা হচ্ছে। নিশীথ সেই যে গেছে, তার পর আর আসেনি। পিসিমা মারা যাওয়ার পর আসতে পারেনি। চার্চয়ের ল্যান্ডফোন থেকে ফোনও করেছি। কিন্তু নিশীথের সঙ্গে কথা হল না। অফিস থেকে বলল, ও কার্শিয়াংয়ে নেই। কী একটা কাজে আউট অফ স্টেশন।

১৮ অক্টোবর

আগামিকাল ষষ্ঠী। শরীরটাও ক'দিন ভালো যাচ্ছে না। নিশীথ কখনও এমন করে না। ও জানে, আমি একা আছি। তাও একটা খবর তো যেখান থেকেই হোক, দেবে। পাহাড়ে দু-একটা জায়গায় পুজো হয়। এটাই আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম পুজো। কিছুদিন আগে ও আমার জন্য একটা হালকা হলুদ রঙের সালোয়ার এনে দিয়েছে। সঙ্গে লাল ওড়না। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। লাল রং নিশীথের প্রিয়। ওটা পরেই আমরা একসঙ্গে পুজো দেখব। কিন্তু নিশীথ কোথায়?

২০ অক্টোবর

আজ বড় আনন্দের দিন। আজই জানতে পারলাম আমি মা হতে চলেছি। খবরটা নিশীথকে দেওয়া প্রয়োজন। ও খুব খুশি হবে। আজ সপ্তমী। আমার যদি মেয়ে হয় তা হলে ওর নাম রাখব আনন্দী। আর ছেলে হলে— ছেলের নাম ঠিক করবে নিশীথ। কিন্তু কোথায় আছ তুমি? তোমার নেহার যে তোমাকে খুব দরকার। তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

২৩

মাঝখানের পাতা অনেকগুলো ফাঁকা। সাদা পাতার কোথাও একটা কালির আঁচড় পর্যন্ত নেই। বিতান পাগলের মতো ডায়েরির পাতা ওল্টাতে থাকে। অনেকগুলো পাতার পর আবার লেখা শুরু হয়েছে। তারিখটা যেখানে শেষ হয়েছিল, তার ঠিক এক বছর পর থেকে আবার লেখা শুরু হয়েছে।

২২ শে নভেম্বর

ঠিক কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না। রাগে, ঘেন্নায়, অপমানে ডায়েরি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। নিশীথ তো আমাকে জেনেশুনেই বিয়ে করেছিল। তবে—! নিজের অন্তঃসত্ত্বা বউকে ফেলে কীভাবে একটা মানুষ চলে যেতে পারে! নিশীথ তো এমন বিট্রে করার ছেলে নয়! আজ যদি ফাদার না থাকত, তা হলে আমার আর আনন্দীর কী হত?

এই কঠিন সময়ে সুরেশদার সাহায্য কোনও দিন ভুলব না। সুরেশদা কী একটা দরকারে এসেছিল চার্চে। নিশীথের ব্যাপারে সব শুনে সে ফাদারের কাছেই কিছুদিন থেকে গিয়েছিল। যতদিন না আনন্দী হচ্ছে, ততদিন আমার দেখশোনা সব কিছু ওই চারু মাসি আর সুরেশদাই করেছে। ফাদার একা হাতে আর কতদিক সামলাবেন! চারু মাসি না থাকলে আমার মেয়েটাকে যে কে মানুষ করত!

আজ নিশীথ থাকলে আমার জীবনটা হয়ত অন্য রকম হত। আচ্ছা, আমার মতো আমার মেয়েটাও কি শেষ পর্যন্ত অরফ্যান হাউসে মানুষ হবে? আমার মেয়েও তার বাবা-মায়ের স্নেহ পাবে না?
এটা তুমি কেন করলে নিশীথ? কী অপরাধ ছিল আমার যে তুমি এত বড় শাস্তি দিলে?

২৫ নভেম্বর

আচ্ছা, নিশীথ বেঁচে আছে তো? এতবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম, কেউ সদুত্তর দিতে পারল না! কেবলই বলছে, নিশীথের মতো আরও কয়েকজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ রকম আবার হয় নাকি? একটা জলজ্যান্ত মানুষ এভাবে উধাও হয়ে গেল!

৩ জুন

মেয়ের দৌরাত্ম্যে ডায়েরি লেখার সময় পাই না। নিশীথের পিসিমার বাড়িটা ভাড়া দিয়ে আমি আবার ফাদারের কাছেই ফিরে এসেছি। একা একা বাচ্চা মানুষ করা খুব কঠিন। যে-টুকু ভাড়া পাই ফাদারের হাতে তুলে দিই। এর বেশি সামর্থ্য তো আমার নেই। ফাদার আর পেরে উঠছেন না। তাঁর বয়স হয়েছে। এই বয়সে অনাহার আর দারিদ্রের সঙ্গে এতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। তার ওপর আবার আমি আর আমার মেয়ে এসে জুটেছি! আমার খুব ইচ্ছে, যেদিন নিশীথ ফিরে আসবে, সেদিন ওকে বলব, এই অরফ্যান হাউসের জন্য কিছু একটা করতে, যাতে এই ছোট বাচ্চাগুলো দু'বেলা দু'মুঠো খাবার অন্তত পায়।

নিশীথ, তুমি ফিরে আসবে তো? তোমাকে যে ফিরে আসতেই হবে। আমি যে অপেক্ষা করছি তোমার জন্য। তুমি আসবে তো?'

তার পর পাতা ওল্টাতেই পাওয়া যায় দুটো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি। ডায়েরির পাতার দু-দিকে ছবি দুটো আঠা দিয়ে লাগানো। প্রথমটায় নেহা আর তার পাশেই হাসিহাসি মুখে মিলিটারিদের মতো পোশাক পরা এক যুবক। ছবিটা তোলা হয়েছিল নেহার বিয়ের পর একটা স্টুডিওতে। ছেলেটা অবিকল বিতানের মতো দেখতে। কিন্তু কী করে সম্ভব! তবে কি সত্যিই পূর্বজন্ম বলে কিছু আছে?

আর দ্বিতীয় ছবিটায় নেহা ও তার মেয়ে আনন্দীর ছবি। একটা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে। মুখটা অবিকল নেহার মতোই। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। ছবিটা দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠে বিতান বলে, ''আমি ফিরে এসেছি নেহা, আমি এসেছি। কোথায় তুমি? ফিরে এসো নেহা, ফিরে এসো।'' তার পর

আনন্দীর ছবির ওপর হাত বুলিয়ে বলে, ‘‘এটা আমার আর নেহার মেয়ে কুর্চি! আমাদের যে সন্তান হয়েছিল জানতেই পারিনি!’’ বলেই ডায়েরিটা বুকে চেপে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বিতান।

কুর্চি বলে, ‘‘আমি তা হলে কাল মরগ্যান হাউসের পেছনে নেহাকেই দেখেছিলাম!’’ বলেই বিতানের কাছ থেকে ডায়েরিটা নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকে। কিন্তু তার পর থেকে ডায়েরির পাতা সব ফাঁকা। আর কোথাও কোনও কালির আঁচড় নেই।

কুর্চি ডায়েরিটা বন্ধ করে বলে, ‘‘এটা এ ভাবে শেষ হতেই পারে না।’’

বিতান তখন উদাস কণ্ঠে উত্তর দেয়। যেন সে অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে। সেখান থেকে সে কথা বলে, ‘‘দুর্গাপুজোর বেশ কয়েকদিন আগে। ছুটি স্যাংশন হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরব। এমন সময় হঠাৎ আমাকে পাঠানো হয় সিয়াচেন বর্ডারে একটা আর্জেন্ট সিক্রেট মিশনে। দুপুর নাগাদ রওনা হই। আমার সঙ্গে আরও দু’জন ছিল। সেদিন ওয়েদার বেশ খারাপ ছিল। আমি যেতে ডিনাই করেছিলাম। কিন্তু ওপর মহলের অর্ডার। যাওয়ার আগে নেহাকে যে একটা খবর দেব, সেই সুযোগটুকুও পাইনি। তখন তো এখনকার মতো মোবাইল ছিল না!

সিয়াচেনের কাছাকাছি যেতেই ওয়েদার আরও খারাপ হতে থাকে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করতে চাইছিলাম। কিন্তু আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের রুট চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল। কোনও ভাবেই আমরা ল্যান্ড করতে পারছিলাম না। ফুয়েল ট্যাঙ্কও খালি হয়ে এসেছিল। তার পর হঠাৎ কী যে হল!’’ চিৎকার করে ওঠে বিতান, ‘‘আমার আর কিচ্ছু মনে নেই।’’

কুর্চি বিতানের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ‘‘রিল্যাক্স, রিল্যাক্স।’’ তার পর বলে, ‘‘কিন্তু নিশীথের সঙ্গে খারাপ যদি কিছু ঘটেই থাকে, তবে সেকথা নেহা জানতে পারল না কেন? এয়ার ফোর্সের তরফ থেকেই বা সেকথা জানানো হল না কেন?’’

এ কথা বলার পরই সে তার জামাইবাবু কর্ণেল মিশ্রকে ফোন করে। সমস্ত কথা খুব সংক্ষেপে বলার পর তিনি জানান, এটা সম্পূর্ণ আলাদা ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু

তা হলেও তাঁর বেশ কিছু পরিচিত কলিগ আছে এয়ারফোর্সে।
কিন্তু এত বছর আগের ঘটনা সম্পর্কে জানাটাও মুশকিল, কিন্তু অসম্ভব নয়। একটু চেষ্টা করলে হয়তো কোনও একটা সন্ধান পাওয়া যাবে।
কুর্চি ও বিতান সেই ডায়েরি হাতে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। বাইরে এসে ফাদার স্যামুয়েলের খোঁজ করতেই একটি বাচ্চা এসে বলে তিনি নাকি মিনিট কুড়ি আগে একটা কাজে বেরিয়েছেন।
চার্চের সামনের মাঠে রোদ্দুরে ভিজতে ভিজতে কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে খেলা করে। ভয়-ভাবনাহীন। এক অদ্ভুত আনন্দ তাদের চোখে মুখে খেলা করে। বিতান এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কুর্চিকে বলে, ''একদিন এই বাচ্চাদের সঙ্গেই আনন্দী বড় হয়েছিল। একদিন এখানেই নিশীথ তার নেহাকে খুঁজে পেয়েছিল।''
কুর্চি বিতানের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারে। বলে, ''আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমাদের জানতে হবে আনন্দী কোথায়? নেহার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল?''
বিতান অস্থির হয়ে বলে, ''কিন্তু আর তো কোনও এভিডেন্স নেই। আর কাকে জিজ্ঞাসা করব? কোথায় খুঁজব?''
কুর্চি বিতানের হাতটা ধরে বলে, ''এত সহজে হাল ছেড়ো না।'' তার পর একটু ভেবে বলল, ''চারু মাসি কে বিতান? জানো তুমি? মনে পড়ছে কিছু?''
বিতান বলে, ''না, এমন নাম আমি শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।''
আরও নানা কথা বলতে বলতে বিকেল নাগাদ ওরা জলসা বাংলোয় ফিরে আসে। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি। অবশ্য দু'জনেরই মনের যা অবস্থা, তাতে শরীরের দিকে নজর দেওয়ার মতো মানসিকতা কারও নেই। বাংলোয় ফিরে কোনও রকমে ফ্রেশ হয়ে ঘর থেকে বেরোতেই দেখা হয়ে যায় রাজেন শেরপার সঙ্গে। তার হাতে একটা প্লেটে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আর চা।
ওরা গাছের নীচেই একটা বেঞ্চে বসে খেতে শুরু করে। রাজেন বেশ আগ্রহ নিয়ে বলে, ''আমি সারাদিন অপেক্ষা করছিলাম আপনাদের জন্য। বলতে পারেন টেনশন হচ্ছিল। আসলে এ রকম একটা ঘটনা—! তা পেলেন কিছু?''

কুর্চি বলে, ''সব বলব রাজেনবাবু। একটা উত্তর এখনও মিলছে না। আর সেটাই চিন্তার।''

রাজেন বলে, ''কী উত্তর মিলছে না ম্যাডাম?''

বিতান বলে ''আপনি কি জানেন চারুমাসি বলে কাউকে? তিনি কি বেঁচে আছেন?''

রাজেন কিছুটা অবাক হয়ে বিতানের দিকে তাকায়। তার পর বলে, ''চারুমাসি? বয়স কেমন হবে? আমার মায়ের নাম চারু। কিন্তু আপনার কোন চারুমাসিকে খুঁজছেন?''

বিতান ও কুর্চি দুজনেই খাওয়া ছেড়ে উঠে যায়। তার পর রাজেনকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি যায় তাদের বাড়ির দিকে।

রাজেনের মা তখন ঘরের ভেতর একটা চৌকির ওপর বসে একেবারে ছিঁড়ে যাওয়া একটা কাঁথা সেলাই করছিল। বিতান তার পায়ের তলায় বসে নিজের পরিচয় দিয়ে একে একে সব কথা বলতে থাকে। নেহার কথা শুনে সেই বৃদ্ধার বসে যাওয়া শুকনো চামড়ার গাল দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে।

সব শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। বাইরে তখন সন্ধে নেমে এসেছে। রাজেন উঠে গিয়ে একটা মোমবাতি জ্বালে। বৃদ্ধা ওরফে চারুমাসি আজ অনেকদিন পর কথা বলে। রাজেনের চোখে জল এসে যায় তার মাকে কথা বলতে দেখে। সে শেষ কবে তার মায়ের কণ্ঠস্বর শুনেছে মনে পড়ে না।

চারুমাসি চৌকি থেকে উঠে গিয়ে ঘরের বাইরে যায়। তার পর আপন মনে বলে, ''একদিন উসকি পতিনে উসে ছোড়কে চলা গয়া। ওই সময় নেহা দিদি কখনও কখনও আমার কাছে গল্প করতে আসত। খুব ভালো মেয়ে ছিল।

আমিও মাঝে মাঝে চার্চে যেতাম বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে। একদিন শুনলাম নেহা দিদি মা হতে চলেছে। আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ওই সময় বেচারির যা অবস্থা হয়েছিল, তা চোখে দেখা যেত না। স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় সে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। সময় মতো খাওয়াদাওয়া না করায় শরীর খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তার পর ফাদার নেহাদিদিকে চার্চে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তখন থেকে আমি নেহা দিদির কাছেই থাকতাম। স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ন'মাস পেরিয়ে যায়। নেহা দিদি আমাকে সব সময়

বলত, দেখবে চারুমাসি একদিন আমার স্বামী আমার কাছে ঠিক ফিরে আসবে। তার পর একদিন নেহাদিদি একটা ফুলের মত সুন্দর মেয়ের জন্ম দিল।''
সবাই রুদ্ধশ্বাসে চারুমাসির কথা শুনতে শুনতে পাহাড়ের ধারে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। মেঘহীন আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ ঝকঝক করে। যেন মনে হয় চেনা পৃথিবী থেকে বহু দূরের এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বসে চাঁদের বুড়ির কাছে তারা রূপকথার কাহিনি শুনছে।
থেমে যায় বৃদ্ধা। সে যেন তার ফেলে আসা গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিনে ফিরে গেছে। একটু দম নিয়ে বলে,
''করিব আট–ন মাহিনে বাদ। বো দিন মুঝে আজভি ইয়াদ হ্যায়। সেদিন দুপুর বেলায় নেহাদিদি আমার কাছে এসেছিল তার মেয়েকে নিয়ে। বলল, মাসি এবার তুমি এই বিচ্ছুটাকে সামলাও। আমি আর পারছি না। বাচ্চা সামলানো আমার দ্বারা হল না। কী মিষ্টি ছিল বাচ্চাটা! নেহা দিদি নাম রেখেছিল আনন্দী। আনন্দী ওই সময় ছোট ছোট পায়ে সবে মাত্র চলতে শিখেছে। নেহা আনন্দীকে কোল থেকে নামিয়ে এই উঠোনেই ছেড়ে দেয়। আর তার পর আমার সঙ্গেই গল্প করতে বসে গেল। ম্যায় উস ওয়ক্ত সায়েদ ঘরকা কুছ কাম রাহি থি। অচানক নেহাকা চিল্লানেকি আওয়াজ আয়ি। ম্যায় দৌড়কে ঘরসে নিকলা তো দেখা—!'' সামনের খাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে, ''উসকি বাচ্চি চলতে চলতে কাব পাতা নেহি ইধার আ গেয়ি, অউর অচানক ইঁহাসে গির গেয়ি'' বলেই শিউরে ওঠেন বৃদ্ধা, ''অউর উসে বাঁচানেকে লিয়ে নেহা বিটিয়াভি ইঁহাসে ফিসল কর—'' বলেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন বৃদ্ধা।

সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। বিতানের মনে পড়ে আজ সকালেই সে নেহাকে দেখেছে এখান থেকে পড়ে যেতে। তার মানে নেহার আত্মা বিতান ওরফে নিশীথকে দেখা দিয়ে হারিয়ে গেছে!
বৃদ্ধা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলেন, ''গিরতে সময় উসকি লাল চুনরি এক পেড়পে আটক গেয়ি। বো চুনরি আজভি মেরে পাস—।'' বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন বৃদ্ধা। সকলের চোখেই জল। ভালবাসায় মোড়া তিনটে জীবন যে এভাবে শেষ হয়ে যাবে কেউ ভাবেনি। বিতানের মুখের দিকে তাকানো যায় না। তার ভেতরে যে

কী উথাল-পাথাল চলছে তা একমাত্র সে-ই জানে। কুর্চি ভাবে, কোথা থেকে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল আর কোথায় এসে শেষ হল! তার স্বামী জাতিস্মর! ভাবাই যায় না। নেহার কথা ভেবে কুর্চির মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। এত অল্প বয়সে এই রকম প্রাণবন্ত একটা মেয়ে—! যে জীবনে কিছুই পেল না, তার এমন মর্মান্তিক পরিণতি মেনে নেওয়া যায় না।

পরের দিন সকালে কুর্চির যখন ঘুম ভাঙে, দ্যাখে তার পাশে বিতান নেই। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দ্যাখে, সেই খাদের সামনে বিতান দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলেশহীন মুখ। কুর্চি কাছে গিয়ে তার হাতটা ধরে বলে, ''আমাদের এখনও একটা কাজ বাকি আছে।'' বিতান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই কুর্চি বলে, ''আমরা নেহার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। কিন্তু তার শেষ ইচ্ছেটা তো পূরণ করতে পারি! মনে নেই নেহা নিশীথের কাছে কী চেয়েছিল?'' তার পর একটু উদাসীন ভাবে বলে, ''আমাদের তো আর সন্তান হল না। কিন্তু ওই অরফ্যান হাউসের ফুটফুটে বাচ্চাগুলোকে কি আমরা সন্তান হিসেবে ভাবতে পারি না? তোমার আমার মান্থলি ইনকাম তো কম নয়। জীবনে টাকার ঠিক ততটাই দরকার, যতটুকু প্রয়োজন। আমরা পারি না আমাদের ইনকামের একটা বড় অংশ মান্থলি এই বাচ্চাগুলোর জন্য দিতে? ওই বাচ্চাগুলোর মধ্যেই হয়তো রয়ে গেছে আমাদের আনন্দী!'' বলেই কেঁদে ফেলে কুর্চি।

বিতান জড়িয়ে ধরে কুর্চিকে। বলে, ''তুমি ঠিক বলছ? এখানেই আছে আমাদের আনন্দী! তোমার মনে আর কোনও রাগ নেই তো কুর্চি? তুমি সত্যি বলছ?''

কুর্চি বিতানের বুকে মাথা গুঁজে বলে, ''আমরা সময় পেলেই এখানে চলে আসব।''

চার্চে ফাদারের সঙ্গে কথাবার্তা ও যাবতীয় প্রোসিডিওর সেরে ওরা ফিরে আসছিল, এমন সময়েই কর্ণেল মিশ্রর ফোন। তিনি নিশিথের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, সেই বছর অক্টোবর মাসে এয়ার ফোর্সের একটা প্লেন কয়েকজন কম্যান্ডো নিয়ে সিয়াচেনে দিকে গিয়েছিল। সেই লিস্টে নিশীথ চ্যাটার্জিরও নাম ছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, এয়ার ফোর্সের সেই প্লেনটি র‍্যাডারের বাইরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওই চত্বরে এবং আশেপাশে বহু অনুসন্ধান চালানো হলেও আজ পর্যন্ত তার কোনও ট্রেস পাওয়া যায়নি।

কুর্চি আর কিছু না বলে ফোন কেটে দিল। বিতান বলল, ‘‘আর কী লাভ কুর্চি নিশীথের সঙ্গে কী হয়েছিল জেনে? কেউই তো আর নেই! এবার আমাদের নিজেদের জীবনে ফিরতে হবে।’’

ওরা জলসা বাংলোয় ফিরে এসে ব্যাগপত্তর নিয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে। রাজেনই সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়। রাতেই ওদের ট্রেন এনজিপি থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি চলে আসে। ওরা গাড়িতে উঠতে যাবে, এমন সময় সেই নেপালী বৃদ্ধা এসে, মলিন হয়ে যাওয়া একটা লাল ওড়না দেয় বিতানের হাতে। গাড়িতে আসতে আসতে কুর্চি ভাবে, যে কোথাও নেই, যে আর কখনও ফিরে আসবে না, সেই না থাকাই চিরতরে রয়ে গেল তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। বিতানের হাতে নেহার লাল ওড়না বাতাসে তখন পতপত করে উড়তে থাকে।